সতীকান্ত গুহ

বাক-সাহিত্য

উৎসর্গ

পরমকল্যাণীয় শ্রীমান
ইন্দ্রনাথ ও সুকান্ত
নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু

দোকানীর মরা শরীর থেকে একটা
তলোয়ার খসিয়ে নিয়ে বড়ভাইও রু
দাঁড়াল। একজনের কাঁধে একটা কে
বসিয়ে, একজনের নাকের ডগাটা···

বিদেশের কিশোর-সাহিত্যে পাইরেট স্টোরি ব বোম্বেটে-কাহিনী অসম্ভব রকম জনপ্রিয়। কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের দেশে বোম্বেটে-কাহিনী তেমন ক'রে আজ পর্যন্ত কেউই লিখলেন না—এক সতীকান্তবাবু বাদে। অধুনালুপ্ত রংমশাল পত্রিকায় তিনি যখন প্রথম তাঁর 'অমরলতা' উপন্যাস শুরু করেন, সে প্রায় আজ সাতাশ বছর আগেকার কথা—তখন কালীভূষণ-ক্ষিতিভূষণের জন্যে দুশ্চিন্তায় বাংলাদেশের অনেক কিশোর-কিশোরীই বিনিদ্র রজনী যাপন করত। সেই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুও ছিলেন। ইদানীং কিশোর-পত্রিকার সম্পাদক হ'য়ে সেই কৈশোর স্মৃতি রোমন্থন ক'রেই বোধহয় সতীকান্তবাবুকে দিয়ে আবার তিনি বোম্বেটে-কাহিনী লেখাতে শুরু করিয়েছেন—তাঁর পত্রিকায়।

আর শুধু বোম্বেটে-কাহিনী কেন, কিশোরদের জীবনে নানা দিক থেকে প্রেরণা দেবার জন্য, অতীতের

গৌরবকাহিনী থেকে শুরু ক'রে আগামী দিনের সম্ভাব্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক জীবনধারা অবলম্বনে অজস্র রচনা তাঁর পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

এই সব অদ্বিতীয় রচনা বইয়ের আকারে মুদ্রণের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকের সঙ্গে।

সেই পরিকল্পনার প্রথম প্রচেষ্টা—সতীকান্ত গুহের অসামান্য কিশোর-সাহিত্য—'ইতিহাসে নেই'।

পূর্বকথা

যখন রাজারা খাঁটি রাজার হালে থাকতেন, অর্থাৎ যখনকার রাজারা যেমনটি যাত্রাগানে দেখতে পাই ঠিক তেমনই মখমল আর জরির ইস্কাবন আঁকা জাব্বাজোব্বা পরে, কোমরে সাত সের ভারী তলোয়ার ঝুলিয়ে রানীদের সঙ্গে বসে গল্প করতেন, দরবারী পোষাক পরেই যখন তাঁরা খেতেন, ঘুমোতেন, হাওয়া খেতে যেতেন—অন্তত যখনকার রাজাদের সম্বন্ধে আমাদের এই রকম একটা ধারণা, তখনকার কথা বলতে যাচ্ছি। কিন্তু তা বলে হাজার বছরের কথা নয়। এখন থেকে মাত্র তিনশো বছর আগে রাজাদের সঙ্গে যাদের আড়াআড়ি ছিল, যারা মাঝদরিয়ায় দেশের রাজার পশরা লুট করে খেত, সেই দেশী বোম্বেটেদের কথা। অর্থাৎ আটপৌরে মানুষের কথা নয়—মানুষের ভিতর যারা বাঘের মতন, ঠিক বাঘেরই মতন যারা ছিল লোলুপ, নিষ্ঠুর, দুর্দান্ত, সাহসী অথচ সত্যিকারের মানুষের মতন প্রাণ দিয়ে যারা কথা রেখে চলত, লুট-যুদ্ধের নীতি বজায় রাখত—সেই তাদের কথা।

তিনশো বছর আগে বঙ্গোপসাগরে একদিন মাঝরাতে ঝড় উঠল। ঝড়ে একটি জাহাজ ডুবি হল। দুটি ভাই, অল্প-লেখাপড়া জানা বাঙালী জোয়ান দুটি ছেলে, সেই জাহাজে করে চলেছিল চাকরির খোঁজে। জাহাজের সঙ্গে সেই দুটি ভাইও তলিয়ে গেল, তারপর

একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে তারা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠল। একসঙ্গে তারা ভেসে চলল।

একদিন…দুদিন…তিনদিন…সাতদিন লোনা জলে, দুটিভাই লোনা হাওয়ায় ভেসে ভেসে রইল। এই সাতদিন লোনা জল খেয়ে শুধু তাদের পিপাসা মিটলনা, ঢেঁকুরও উঠল। না কেঁদে তারা হাসি-মস্করা করল। একবার ছোটভাই বলল, "দাদা, চাকরি চেয়েছিলে, ভগবান চাকরিই জুটিয়ে দিলেন—সমুদ্রের পাহারাদারের চাকরি!"

বড়ভাই খানিক হেসে বলল, "হ্যাঁ"।

সাতদিন সাতরাতের শেষে শেষ সম্বল খুইয়ে প্রাণ-সম্বল নিয়ে তারা লঙ্কার রাজধানীতে পৌঁছল। তার পরের কথা।

ক্ষিদেয় তেষ্টায় কাতর দুটি ভাই খুঁজতে খুঁজতে প্রথমে উপস্থিত হল একটি খাবারের দোকানের সামনে। বড়ভাইকে বাইরে রেখে ছোটভাই ঢুকল দোকানে—খাবাবেব চেষ্টায়।

দিব্যি বড় দোকান। খাবারের দোকান না বলে ভোজনশালা বলাই উচিত। রাত তখন বাবোটা হয়ে গেছে। কয়েকটা লোক কিন্তু তখনও মস্ত ঘরের একদিকে এককোণে বসে খাচ্ছে। তাদের চেহারা আর আড়চোখে তাকানোর ভঙ্গি দেখে বুঝতে বাকী থাকে না, তারা কারা! তাদের কাপড়-জামা খুঁজলে দুয়েকখানা ছুরি-ছোরা নির্ঘাৎ বার হবে। তাদের যে-জিভ অনর্গল মিছে কথা কয়, সেই জিভ দিয়ে সত্যিকথা কওয়ানো সম্ভব হলে জানা যেত কে কটা খুন রাহাজানি করেছে।

দোকানী বলল, "খাবার? আচ্ছা লোক দেখছি তুমি! খাবারের ভাবনা কি!" বলে হি হি করে দোকানী হেসে উঠল—"ভাবনাটি হচ্ছে পয়সার। পয়সা ফ্যালো, খাবার নাও।"

ছোটভাই বলল, "আজ ধারে দাও। পয়সা তো আজ হবে না, একটা কাজ জুটিয়ে নি। দেখছো না বাংলা মুলুকের লোক, জাহাজ ডুবি হয়েই না পচা লঙ্কারাজ্যে এসে পড়েছি।"

দোকানী বলল, "ও! তা আগে বলতে হয়!" তারপর একটা ঠোঙা ভরতি খাবার এগিয়ে দেওয়ার ভান করে সে বলল, "নাও হে, হাত পাতো।"

ছোটভাই আগ্রহে একটি হাত এগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে নিয়ে হাতের পাতাটা চেপে নিদারুণ যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সে দোকান ছেড়ে বার হয়ে এল।

চুল্লি খোঁচাবার গন্‌গনে শিকটা দোকানী ছোটভাইয়ের হাতের তেলোয় চেপে ধরেছিল। সে খিলখিল করে হেসে উঠল। ঘরের কোণে বসে যে কজন ষণ্ডামার্কা লোক তখন খাচ্ছিল, তারা একসঙ্গে সামনে তাকাল। পরিহাসটা বুঝে নিয়ে তারাও হো হো করে হেসে দিল।

বড়ভাইয়ের চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে উঠল। খানিকটা জামা ছিঁড়ে নিয়ে ছোট ভাইয়ের হাতটা বেঁধে দিয়ে সে ছোট-ভাইয়ের কপালে হাত বুলোতে লাগল। ছোটভাইয়ের ছলছল চোখের পানে তাকিয়ে তারও চোখে জল এল, দাঁতে দাঁত চেপে সে কান্না চাপল। হঠাৎ মুখ তুলে ঠাস করে ছোটভাইয়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে সে বলল, "এই, কাঁদিসনে। হাতের চামড়া ফের গজাবে, কিন্তু মার খেয়ে কান্না চলবে না।"

"ঠিক, ঠিক বলেছ ভাই"—তাদের পাশে কে যেন বলে উঠল।

দুই ভাই চমকে ফিরে তাকালো। বড়ভাই বলল, "কে হে বাপু তুমি?"

দোকানের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে। লোকটা অন্ধকার ছেড়ে আলোয় এগিয়ে এল। বলল, "আর জিজ্ঞাসা করে

লজ্জা দাও কেন ভাই। ধরা-চুড়ো যা দেখছ তাতেই তো বোঝা উচিত।”

রাস্তার ওধারে একদল ভিখিরি এঁটো কুড়োচ্ছিল। এই লোকটাকে সে-দলেরই যেন মনে হল। সন্ধ্যা থেকেই সে ঘুরঘুর করছিল। কিন্তু সে এঁটো কুড়োয়নি, ভোজনশালার সামনে গুনগুন করে গান ভেঁজে, ইতস্তত ঘুরছিল। মাথায় ফেটি বাঁধা, লোকটার অভিসন্ধি বোঝা ভার।

বিরক্ত হয়ে দুই ভাই তফাতে সরে এল, বড়ভাই ছোটভাইয়ের পানে একটি বার তাকিয়ে তারপর অনেকটা আপন মনেই বলল, “হেঁ! একবার ব্যাপারটা দেখে আসতে হচ্ছে।”

বড়ভাই দোকানের দিকে এগোতে গেল। বড়ভাইয়ের চোখের চাহনি যেন স্বাভাবিক নয়। তার গলাটাও অসম্ভব গম্ভীর। ছোট ভাই প্রমাদ গণল। ভাবল, দুশমনের আড্ডায় কী হাঙ্গামাই না এবার বাধে।

ছোটভাই বিস্মিত কণ্ঠে বলল, “দোকানে? আবার ঐ দোকানে যাচ্ছো?”

বড়ভাই ভয়ঙ্কর সুরে ফিসফিস করে বলল, “দোকানী খাবার খাইয়েছে। পাওনা শুধতে হবে না?”

সেই লোকটা আবার কখন সরে এসে দুটি ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল, কান পেতে শুনছিল। সমঝদারের মতন হেসে সে বলল, “ঠিক, ঠিক বলেছ ভাই।”

বড়ভাই এবার মুখখানা ভয়ঙ্কর করে বলল, “কে বাপু তুমি? ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো তো।”

সেই লোকটা খোশমেজাজে বলল, “বলেছি তো পোষাকেই পরিচয় মালুম হবে। আর সরে পড়া তো চলবে না, তাহলে দোকানী এত খাবার খাওয়াবে যে সে-পাওনা শুধতে তোমরা দুটি ভাই আর নাও বেঁচে থাকতে পারো।”

"তার মানে ?"—বড়ভাই চটে বলল।

"তার মানে বাপু, দল বেঁধে লোকগুলো যদি তোমাদের দুটি-ভাইয়ের ছাল ছাড়িয়ে নিতে চায়, তাহলে ?"

"তাহলে তুমি এমন কোন্ নবাব এলে যে বিহিত করবে ?"

আবার লোকটার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল। হঠাৎ ছেঁড়া পোষাকের লুকোনো ভাঁজ থেকে সে একটা তলোয়ার বার করে আনল—দোকানের জানালার আলোয় তলোয়ারটা ঝকমক করে উঠল। সরু সুশাণিত তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

দাঁত কড়মড় করে লোকটা বলল, "ভাইয়ের হাতের যেটুকু চামড়া খোয়া গেছে, নিয়ে এসো। নইলে ভাইকে ঘরে ফিরে যেতে বলো, আর এই নাও, এই দড়িটা সামনের গাছে টাঙিয়ে ঝুলে পড়ো।"

কয়েক পাক দড়ি বার করে সে সত্যিই বড়ভাইয়ের সামনে ফেলে দিল। সে কে, এতকথা বলার কী তার অধিকার—এ জিজ্ঞাসা দুটি ভাইয়ের মনে এল না, শুধু দুজনের রক্ত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বড়ভাইয়ের দুটো হাত মুঠো হয়ে এল। লোকটার হাত থেকে তলোয়ারটা ছিনিয়ে নিয়ে পাগলের মতন দোকানে ছুটে গেল। ছোটভাইকে আগলে সেই লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখে তখন আবার রহস্যের মতন হাসি ফুটে উঠেছে।

ততক্ষণে দোকানে ঢুকে দোকানীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বড়ভাই।

"এই তোমার খাবারের পাওনা বুঝে নাও!" অস্বাভাবিক চাপা গলায় বড়ভাই গিয়ে বলল, "এইমাত্র যে খাবার খাওয়ালে, তার দাম!"

দোকানী চমকে উঠল। ব্যাপারটা চট করে বুঝে নিয়ে চড়া গলায় বলল, "মাগনা খেতে এলে অমন একটু-আধটু খোঁচা খেতেই হয়, বাপু।"

সেই দুশমনগুলোর ততক্ষণে খাওয়া শেষ হয়েছে। তারা দোকানীর এতটা নরম মেজাজ দেখে খুশী হল না, চেঁচিয়ে বলল, "এই, দাও না খাবার খাইয়ে ?"

দোকানীর তবু যেন সাহস হল না, সে একটু বিপন্নের মতন দুশমনদের পানে তাকাল। তারা তখন ভেংচি কেটে চুল্লিতে শিকটা দেখিয়ে বলল, "খাবার ভালো করে খাইয়ে দাও!"

বড়ভাই পাথরের মতন নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিল। দোকানীর হঠাৎ সাহস হল, সে বলল, "খাবার না খাইয়ে পাওনা নেবো না। নাও হাত পাতো।"

বড়ভাই অম্লান মুখে হাত এগিয়ে দিল। দোকানী আড়চোখে তাকিয়ে উনুনের শিকটায় টান দিল। ঘরের কোণে দুশমনগুলি মুচকি মুচকি হাসতে স্থরু করল।

বড়ভাই তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দোকানী হঠাৎ গনগনে শিকটা তুলে নিয়ে বড়ভাইয়ের হাতের তেলোয় চাপতে গেল। বড়ভাইয়ের তলোয়ার-ধরা লুকোনো বাঁ-হাতটা কাপড়ের ভাঁজ থেকে সাপের ছোবলের মতন ছটকে এসে এক কোপে শিকটাকে ফেলে দিল। তারপর, সেই তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, ক্ষুরধার তলোয়ার হাতে বড়ভাই পাগলের মতন দোকানীর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, একেবারে কাঠের থামের সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে তাকে গেঁথে ফেলল।

দুশমনগুলোর মুখের হাসি চকিতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু শয়তানের বাচ্ছা তারা। যে যার পোষাকের লুকোনো ভাঁজ থেকে তলোয়ার বার করে চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে এল। দোকানীর মরা শরীর থেকে এক টানে তলোয়ারটা খসিয়ে নিয়ে বড়ভাইও রুখে দাঁড়াল। একজনের কাঁধে একটা কোপ বসিয়ে, একজনের নাকের ডগাটা কেটে আর দুজনের কপালে দুটো ফলা এঁকে দিয়ে বড়ভাই ছুটে দোকানের বাইরে চলে এল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বড়ভাই বলল, "দোকানীটাকে একেবারেই মেরে ফেলেছি। কিন্তু আর চার জনের ছাল তুলেছি। এখন তাহলে—"

"এখন তাহলে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া দরকার"—বলে হেসে সেই লোকটা শিস দিল।

"বিশ্বাসঘাতক!"—বলে বড়ভাই তলোয়ার হাতে সেই লোকটার দিকে রুখে যেতেই হেসে সে তার হাতখানা ধরে ফেলল। ছোটভাই, সে-ও এসে এক হাতে বড়ভাইয়ের আর একটা হাত চেপে ধরল। দুজনে মিলে অসুরের মতন বড়ভাইকে থামাল। বড়ভাই ভাবল—কী আশ্চর্য! ছোটভাইয়ের মাথাটা খারাপ হল নাকি? দাদাকে ধরিয়ে দিয়ে তার কী লাভ!

সেই লোকটার শিস শুনে হঠাৎ অন্ধকারে চারদিক থেকে কারা সাড়া দিয়ে উঠল। দেখতে দেখতে অগুনতি ভিখিরি এসে তাদের ঘিরে ফেলল। সেই লোকটা আকাশে হাত তুলে ইশারা করতেই ভিখিরিরা যে যার ছেঁড়া পোষাকের ভাঁজে হাত দিল। পরমুহূর্তে প্রত্যেকের হাতে একখানা তলোয়ার ঝকমকিয়ে উঠল।

সেই লোকটা বড়ভাইকে হেসে বলল, "দোকানের দুশমনগুলো আর এগোবে না। তারা আমাকে বিলক্ষণ চেনে। কিন্তু এখনি সিপাইরা এসে পড়বে, আমাদের উধাও হতে হবে।"

সেই লোকটার ইঙ্গিতে দলের একজন একটা শিঙা ফুঁকে দিল। দেখতে দেখতে অন্ধকারের একটা দিক থেকে একদল ভিখিরি ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হল। তলোয়ার বার করে তারা সেই লোকটাকে অভিবাদন করল।

তাদের আড়ালে অন্ধকারে আরো সব ঘোড়া বাঁধা ছিল। ভিখিরিরা সকলেই একটি করে ঘোড়ায় চাপল, তারপর ঝড়ের মতন সেই রহস্যময় ভিখিরি ঘোড়সওয়ারের দল ছুটে চলল দক্ষিণে।

সেইসঙ্গে সেই লোকটার পাশে পাশে আর দুটি ঘোড়ায় চেপে দুই ভাইও ছুটে চলল।

রাজধানী ছাড়িয়ে অনেকটা দূর এসে ঘোড়সওয়াররা একবার একটু থামল। তখন বড়ভাই সেই লোকটিকে বলল, "তোমার ভিখিরির দল না থাকলে আজ আর রক্ষা ছিল না। যাক, রাজধানীতে আমাকে কেউ চেনে না, খুনে বলে সনাক্ত করে শহর-কোটালের সাধ্য কী? এখন তাহলে আমরা দুটি ভাই বিদায় হই। এই নাও তোমার তলোয়ার।"

সেই লোকটা হেসে হাত গুটিয়ে নিয়ে বলল, "না, ও তলোয়ার এখন তোমার।"

বড় ভাই বলল, "আমার?"

সেই লোকটা বলল, "হ্যাঁ, কেননা এখন তুমি আমাদের।"

বড়ভাই বলল, "কে—তুমি কে?"

সেই লোকটা টান মেরে তার ভিখিরির সাজ খুলে ফেলল। তারপর মুখোশটা খুলতেই, বড়ভাই অবাক হল। তার সামনে সে তখন ঘোড়ার পিঠে দেখছে—তখনকার সবচেয়ে নামজাদা বোম্বেটে দিব্যবর্ণ।

এমনি করে বোম্বেটেগিরিতে দুই ভাইয়ের হাতে খড়ি। শঙ্খমার্কা আর সাপমার্কা বোম্বেটেদের নামে তখন সাত সমুদ্র ভয়ে কাঁপত। শঙ্খমার্কা বোম্বেটে দলের সর্দার দিব্যবর্ণের নাম শুনলে মাঝিমাল্লারা ভয়ে মূর্ছা যেত। সেই দিব্যবর্ণের বোম্বেটেরা ভিখিরি সেজে লঙ্কার রাজধানীতে ঘুরে বেড়াত। কবে কোন্ জাহাজ কী পশরা নিয়ে কোথায় রওনা হবে, কোন্ জাহাজ সাগর পাড়ি দিয়ে বন্দরে ভাসবে, ভিখিরির বেশে রাজধানীতে ঘুরঘুর করে সে সব সংবাদ আদায় করত।

বোম্বেটে-সর্দার
দিব্যবর্ণ

কালীভূষণ

সেদিন রাজধানীতে কাজ শেষ করে দিব্যবর্ণ সদলে রাজধানী ছেড়ে ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সরাইখানার সামনে দেখতে পেলেন অসুরের মতন জোয়ান ছুটি সুশ্রী যুবককে। দেখে তাঁর লোভ হল। এদের বোম্বেটে দলে টানতে পারলে ভারী চমৎকার হবে। দিব্যবর্ণ তখন সদলে সরাইখানার সামনে ঘুরঘুর করতে থাকলেন। নিয়তির লিখন। ঘটনাচক্রে অবশেষে যুবকছুটি দিব্যবর্ণের হাতের মুঠোয় এসে পড়ল।

এই ছুই ভাই—কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ। প্রথমটা সাধারণ বোম্বেটে হিসেবে তাদের নাম রটল। কিন্তু এক বছরের ভিতর দিব্যবর্ণ নিরুদ্দেশ হলেন। দিব্যবর্ণের গায়ে ছিল লঙ্কারাজবংশের রক্ত। বোম্বেটে দলকে ক্রমশঃ ছুর্ধর্ষ শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেখে লঙ্কাসম্রাটের টনক নড়ল। লঙ্কার সিংহাসনের উপর দিব্যবর্ণের কালোছায়া যেন লঙ্কাসম্রাট দেখতে পেলেন। লঙ্কার মন্ত্রণাসভায় মন্ত্রীদের পরামর্শ শুরু হল। খবরটা কাকের মুখে দিব্যবর্ণ পেয়ে গেলেন এবং তারপরই লঙ্কা থেকে, তার বোম্বেটেদল ছেড়ে উধাও হয়ে গেলেন।

দিব্যবর্ণ নিরুদ্দেশ হতে স্বাভাবিক নিয়মেই তখন তাঁর বোম্বেটে দলের সর্দার হল এই ছুই ভাই। লাভ লোকসানের, বিপদ ও ফুর্তির প্রতিটি বিষয়ে আধাআধি বখরা হল ছুজনের। একদিন পয়সা নেই বলে গায়ের চামড়ায় দাম দিতে হয়েছিল ছোটভাইয়ের, সে-কথা ছোটভাইও ভোলেনি, বড়ভাইও ভোলেনি। তাই লুটের ব্যবসায়ে নেমে তারা ক্ষেপে গেল। টাকার নেশায় মেতে তারা ভুলল, রক্তের দাম কত! এক বছর যেতে না যেতে কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের নামে সমস্ত লঙ্কারাজ্য সাড়া দিয়ে উঠল। তাদের আশ্চর্য নিষ্ঠুর বীরত্বের কাহিনী শুনে ভারত মহাসাগর, আরব-সাগর ও চীন সাগরের নাবিকদের হৃদয়ও থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আমাদের কল্পনা দিয়ে যাদের সাহস আর কৌশলের বেড় পাইনা, তাদের আমরা মানুষ বলে স্বীকার করতে নারাজ। তাই, যাদের সাহস আর কৌশল মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাদের আমরা দেবতা অথবা অপদেবতা বলে মনে করি। কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের বেলায়ও এই রীতির ব্যতিক্রম হল না।

সে-তল্লাটে সমুদ্রের নাবিকদের চোখে কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ ছিল দুটি রহস্য, পিশাচলোকের দুটি কালো ছায়া। অপদেবতার মতন নিঃশব্দে এসে কখন তারা সদাগরী নৌকোয় আগুন জ্বালিয়ে দিত, সৈন্য মাল্লারা কেউ টের পেত না। গভীর রাতে ভূমিকম্পেব মতন সদাগরী বহরে তাণ্ডব জাগিয়ে, মশালের আগুনে অজস্র রক্ত ঝরিয়ে, সাত রাজার ঐশ্বর্য লুঠ করে তারা অন্ধকারে মহাসমুদ্রে উধাও হয়ে যেত। বিস্মিত, আহত সদাগরদের কানে দুর্দান্ত দুই বোম্বেটের অনুচরদের বিকট গলার বোম্বেটী গান ঝড়ের কোলাহলের মতন বেজে উঠে ঢেউয়ের কলরোলে মিলিয়ে যেত। রহস্যের মতন হঠাৎ দেখা দিয়ে হঠাৎ তারা অন্তর্ধান করত।

সেই সময়ে, ইতিহাসে কালোছায়া ঘনিয়ে এল। রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁর সকলে মিলে দুঃস্বপ্ন দেখতে সুরু করলেন। তাঁরা কল্পনায় দেখলেন, ডাঙায় আজ পর্যন্ত যত রাজ্য-সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছে, তাদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছে এক বিশাল সাগরসাম্রাজ্য। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে সেই বোম্বেটে সাম্রাজ্য— সাত সমুদ্রের সাত দিগন্ত পেরিয়ে খুনের নেশায় মাতাল সেই সাম্রাজ্য পাগলের মতন এসে ঢুঁ দিচ্ছে ডাঙার পৃথিবীকে। আর মানুষের তৈরি সহস্র বছরের সভ্যতা যেন একখানা ঘুণে-ধরা বাড়ির মতন ধুলোয় গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মানুষের অদৃষ্টের ইতিহাস লেখেন ঈশ্বর। সাধ্য কি তাঁর নিষেধ এড়িয়ে মাথা তোলে বোম্বেটেদের সাম্রাজ্য! একদিন

আশ্চর্য এক ঘটনার* মধ্য দিয়ে জলপৃথিবীর ভাবী দুটি সম্রাট কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ এসে লঙ্কা-সম্রাটের রাজ-বোম্বেটে দলে নাম লেখাল, বোম্বেটেদের জাহাজে যেখানে আঁকা ছিল মাথার খুলি, সেখানে আঁকা হয়ে গেল লঙ্কার রাজমুকুট।

তখনকার বড় বড় রাজা আর সম্রাটেরা গোপনে বোম্বেটেদল পুষতেন। বাইরে মিত্রতা বজায় রেখে লুকিয়ে এ ওঁর জাহাজ লুঠ করে রাজকোষ ভরাট করতেন। লঙ্কারাজের বোম্বেটেদলটি কালীভূষণের স্বাধীন বোম্বেটে দলের হাতে মার খেয়ে খেয়ে আধমরা হয়ে পড়েছিল। কালীভূষণ-ক্ষিতিভূষণের দলকে পেয়ে রাজবোম্বেটেদলটি দুর্ধর্ষ হয়ে পড়ল।

কালীভূষণ-ক্ষিতিভূষণ নামে অধীন হল—আসলে লঙ্কার সম্রাটের বন্ধু হল তারা। তাদের তোয়াজ করে লঙ্কার সম্রাট আর পথ পেতেন না। বোম্বেটে ভাই দুটি আগের মতন অবাধে জল পৃথিবীর কর আদায় করে ফিরতে লাগল। কিন্তু সেই কর এসে সুগোপনে রাজকোষে জমা হতে থাকল। লঙ্কার রাজ্য তখন ওলন্দাজরা মাকড়ের মত শুষছে। লঙ্কারাজের কাছে ইংরেজদের উপদেশ অভয়-বাণী পৌঁছচ্ছে, কিন্তু একটি সৈন্য-সাহায্যও আসছে না, কেননা, ভারতবর্ষে তখন চারিদিক টলমল। ইংরেজ সেখানে ঘর সামলাতে ব্যস্ত, এই সময়ে দরিদ্র লঙ্কার রাজভাণ্ডার কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণকে পেয়ে হেসে দিল।

এই যে দুটি বোম্বেটে, কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ—এরা যে বাঙ্গালী তার সহজ প্রমাণ এদের নাম। কখন তারা বাংলা দেশের আকাশ থেকে খসে লঙ্কার আকাশে উদিত হল, তার সঠিক তারিখ উদ্ধার হয় নি। এমন কি, আশ্চর্যের বিষয়—যে কালীভূষণ ও

---

* লেখকের 'অমরলতা' উপন্যাসে সে-কাহিনী বিবৃত।

ক্ষিতিভূষণের করাল ছায়া তিনটি সমুদ্রের উপর পড়েছিল, যাদের ক্ষুধিত গ্রাসের সামনে গোপনে নানা রাজ্যের রাজারা কাঁপতে সুরু করেছিলেন, সেই দুটি আশ্চর্য পুরুষের ছায়া ইতিহাসেও পড়েনি! হয়তো এতে আশ্চর্য বোধ করবার কিছু নেই। ইতিহাস তো লেখে মাত্র একটি মানুষ। কিন্তু এই যে আমরা লক্ষ লক্ষ লোক নিজেদের হাসি-কান্নার কথা দিয়ে জীবন-ইতিহাস লিখি, তা থেকেও কি অনেক আশ্চর্য মানুষ বাদ পড়ে যায় না?

১

সমুদ্র থেকে একটা দুরন্ত ঝড় প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ মাথায় নিয়ে লঙ্কার রাজধানীর উপর কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। তারপর বিদ্যুতে চমকে উঠে, বাজের ধমকে হাততালি দিয়ে দুর্যোগের রাতের অন্ধকারে বেপরোয়া খেলোয়াড়ের মতন নীচে ঝাঁপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ করে ক্ষ্যাপা মোষের মতন ঝোড়ো হাওয়া অন্ধবেগে ছুটে এসে রাজধানীর ভিতে ঢুঁ মেরে চলল। মনে হল কোথা থেকে হঠাৎ একটা বিরাট বাহিনী এসে রাজধানী আক্রমণ করেছে। আর অন্ধকারে দিকভুল হয়ে একদল ঘোড়সওয়ার রাজধানীর চারিদিকে অবিরাম পাক দিয়ে মরছে।

দেখতে দেখতে পথঘাট নির্জন হল। জানলা কবাট বন্ধ হয়ে গিয়ে ঘরবাড়িগুলো কবন্ধের মতন নিঃশব্দে ঝড়ের আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে রইল। মানুষের পৃথিবী থেকে যেন মানুষের চিহ্ন মুছে গেল।

লঙ্কার রাজপ্রাসাদে এই দুর্যোগের রাতে দুটি মানুষ মন্ত্রণা-সভায় বসেছেন। তাঁদের চিন্তাকুল মুখ ও কুঞ্চিত ললাট দেখে বুঝতে বাকী থাকে না যে আশার ক্ষীণতম আলোও তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁদের আলোচনায় মাঝে মাঝে ছেদ পড়ছে। বারবার তাঁরা মন্ত্রণা-সভার কবাটের দিকে তাকাচ্ছেন।

প্রাসাদের সদরে রাতের তৃতীয় প্রহর শুরু হবার ঘণ্টা বাজল। দুজনে চমকে উঠলেন, উৎকর্ণ হয়ে ঘণ্টা শুনতে লাগলেন। তারপর

মহামন্ত্রী কুলরত্ন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "না, সম্রাট! এহেন প্রলয়ের রাতে যমও বুঝি মানুষকে নিতে আসে না। মানুষ তো কোন্ ছার। আর আমাদের অপেক্ষা করা মিছে।"

লঙ্কাসম্রাট বললেন, "মন্ত্রী! যার অপেক্ষায় আছি, ঝড়জল তাকে রুখতে পারে না। আমার মন বলছে, সে আসবে—না এসে পারে না।"

মন্ত্রী বললেন, "সম্রাট! এ কি ঝড়জল? এ যে প্রলয়কাণ্ড! আমি বলি, সম্রাট, আপনি অন্তঃপুরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি বরং তার অপেক্ষায় থেকে এই মন্ত্রণা-সভায় আজকের মতন রাতটা কাটিয়ে দিই।"

সম্রাটের মুখ ক্ষণিকের জন্য ম্লান হল। তাঁর ললাটে দুর্ভাবনার রেখা ফুটে উঠল। হতাশস্বরে বললেন, "কিন্তু সে যদি না আসে, এখনই কিছুক্ষণের মধ্যে না এসে পৌঁছোয়—তাহলে আমাদের কোনো উপায়ই আর থাকবে না। লঙ্কারাজ্য তার মান-সম্মানের সঙ্গে তার রাজপুত্রকেও হারাবে।"

মন্ত্রী বললেন, "সম্রাট! এইরকম একটা অঘটন ঘটতে পারে ভেবেই আমি বলছিলুম, অভিমান ত্যাগ করে আপোষে রাজী হোন। খানিকটা মান খুইয়ে অন্তত রাজপুত্রকে বাঁচান। বিপদে খানিকটা ছাড়াই বুদ্ধিমানের কাজ, সম্রাট!"

সম্রাটের দুটি হাত মুঠ হয়ে এল, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "যদি আপোষ না করি? যদি সাহসে বুক বেঁধে অদৃষ্টের ছকে একবার পাশার দান ফেলে দেখি, তাহলে?"

মন্ত্রী ভয়ে মুহ্যমান হয়ে বললেন, "তাহলে সর্বনাশ হবে, সম্রাট! কালীভূষণ-ক্ষিতিভূষণ নেই। এ অবস্থায় মাঝদরিয়ায় নেতাহীন আমাদের সরকারী বোম্বেটেরা কচুকাটা তো হবেই, সেইসঙ্গে রাজপুত্রকেও আমরা হারাবো। আজ যদি দিব্যবর্ণ নিরুদ্দেশ না হতেন, লঙ্কার এই বিপদে—"

সম্রাটের মুখ কালো হয়ে এল। সিংহাসন থেকে অর্ধেক উঠে বললেন, "দিব্যবর্ণ রাজদ্রোহী। লঙ্কার সিংহাসনের উপর তার লোভ। তার নিরুদ্দেশ হবার অর্থ আর কিছু নয়—তফাতে হটে গিয়ে চক্রান্তের পাকে গিঁঠ দেওয়া। লঙ্কারাজ্যের মান বাঁচাতে দিব্যবর্ণের পক্ষে প্রাণ দেওয়া অসম্ভব নয়, মন্ত্রী। কিন্তু তার হিসেবে রাজপুত্রকে উদ্ধার করা আর তার নিজের পায়ে কুড়োল মারা, একই কথা। তার জন্য হা-হুতাশ না করে কালীভূষণ-ক্ষিতিভূষণের উপস্থিতি কামনা করুন মন্ত্রী!"

মন্ত্রী সন্ত্রস্ত হয়ে কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। দুর্যোগের রাতের সব শব্দ আচ্ছন্ন ক'রে, চরাচর কাঁপিয়ে, ঝড়ের আকাশ চৌচির ক'রে, কানে তালা লাগিয়ে একটা বাজ প্রাসাদের কাছে ফেটে পড়ল। প্রাসাদের ভিতসুদ্ধ থরথর ক'রে কেঁপে উঠল।

সেইসঙ্গে, কবাটের ওধারে কাদের বর্ম ও তলোয়ারের ঝনঝনানি শোনা গেল।

সান্ত্রীদের দু-হাতে সরিয়ে দিয়ে সাঁজোয়া-পরা দুটি বিরাট মূর্তি ঝড়ের মতন সভায় এসে ঢুকল। তাদের দেখে মনে হয় যেন মানুষের বেশে দুটি নিশাচর। নির্ভীক বেপরোয়া তাদের চাল, বিপদকে তুচ্ছ করবার দুঃসাহস তাদের চোখেমুখে। নিষ্পলক তাদের চোখে কঠোর সঙ্কল্পের আভাষ। তারা যেন জীবনের দুটি শনিগ্রহ—জলে-স্থলে তাদের যেন অবারিত পথ। আজানু নত হয়ে তারা দুজনে সম্রাটকে নিঃশব্দে অভিবাদন জানাল।

বিস্ময় ও উত্তেজনার প্রথম জেরটা কাটবার পর সম্রাট অভিভূত-কণ্ঠে বললেন, "ভাবতে পারিনি এই দুর্যোগে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তোমরা রাজধানীতে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু বিপদের মধ্যে আশা ছাড়তেও পারিনি।"

ছু-জনের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে সম্রাটকে অভিবাদন করে বলল, "দুর্যোগের কানুন মেনে চলা আমাদের ধাতে নেই, সম্রাট ? যতদিন আপনার অনুগ্রহ আমাদের উপর থাকবে, ততদিন আমাদের আকাশে মেঘ নেই, আমাদের পৃথিবীতে দুর্যোগ নেই।"

কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের পানে তাকিয়ে সম্রাটের বিশ্বাস হল এবার নির্ভয়ে অদৃষ্টের ছকে পাশার দান দেওয়া চলে।

২

কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ যেদিন ভোরে বোম্বেটে দল নিয়ে পর্তুগিজদের নৌবহর লুঠ করতে আরব সাগরের দিকে রওনা হয়, সেদিন মাঝরাতে লঙ্কার রাজধানীতে বিস্ময়ের অতীত এক ঘটনা ঘটে।

সেদিন লঙ্কারাজ্য মহাধূমধামে দশানন-উৎসব পালন করছিল। মহাবীর দশাননের নামে সারা লঙ্কা শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়। রাজধানীতে ধূমধাম মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, উৎসব উচ্ছৃঙ্খলতায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজধানীর এই মত্ততা দেখে সভাকবি মেঘবর্ণ টিপ্পনি কেটে বলেছিলেন—আজ যদি একহাজার সৈন্য নিয়ে কেউ আক্রমণ করে, তাহলে অনায়াসে সে লঙ্কা জয় করতে পারে! সভাকবি তখন ভাবেননি যে রাত না পোহাতে তার চেয়েও লজ্জাকর এক ঘটনা ঘটবে।

গভীর রাতে উৎসবক্লান্ত রাজধানীর চোখে ঘুম নেমে এল। তারপর সেই ঘুমন্ত রাজধানী হঠাৎ যেন একটা মহাদুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল। রাজধানীর পথে ঘাটে, ঘরে বাইরে একটা বিরাট হৈ হৈ, একটা ভীষণ লণ্ডভণ্ড বেধে গেল। আর্ত চীৎকার শোনা গেল— "বোম্বেটে। বোম্বেটে! পালাও, পালাও!"

যে যে-ভাবে, যে-অবস্থায় ছিল—বিছানা ছেড়ে যে যে-দিকে পারে পালালো। যারা পালাতে ইতস্ততঃ করল, তারা জানালা খুলে সমানে 'বোম্বেটে, 'বোম্বেটে' বলে চেঁচিয়ে চলল। সেদিনের

উৎসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শেষরাতে: যেন একটা আজব উৎসব শুরু হল।

সঙের মিছিলের নকল বীরদের মতন তলোয়ার খেলাতে খেলাতে আকাশে গাদা বন্দুকের আওয়াজ করতে করতে একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছিল। থেকে থেকে তারা চেঁচিয়ে মুখভঙ্গী করে মহা আস্ফালন করছিল। তাদের রকম সকম দেখে মনে হচ্ছিল তাদের হাত থেকে আর রাজধানীর নিস্তার নেই।

ঘুমন্ত রাজধানী ব্যাপারটা ঘুমের চোখ দিয়েই দেখেছিল। না হলে হয়তো ভয় পাবার আগে, পালাবার আগে একবার লক্ষ্য করে দেখত সেই দলটার কোথায় যেন একটা ফাঁকি

রয়েছে। এরা যেন সাজানো বোম্বেটে, তাদের আস্ফালনের সবটাই যেন নকল বীরত্ব।

সেই নাটকীয় বোম্বেটে দলটি হৈ হৈ করতে করতে সোজা রাজপ্রাসাদে এসে হানা দিল। প্রাসাদের সিপাই সান্ত্রীরা, রাজধানীর ফৌজরা আসল ব্যাপারটা বুঝবার আগেই তারা সদর ভেদ করে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ল। অতর্কিতে রাজপুত্রের ঘরে হানা দিয়ে তাঁকে বগলদাবা করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে যেভাবে আস্ফালন করতে করতে এসেছিল, সেইভাবেই ফিরে চলে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা শুরু হয়ে শেষ হতে এক দণ্ড সময়ও বুঝি লাগল না। যাবার সময় বোম্বেটেদল রাজপুত্রের বিছানায় একটা চিঠি রেখে গেল।

চিঠিটা সম্রাটের উদ্দেশে লেখা—

মহামান্য লঙ্কেশ্বর,

চীন সম্রাট একদিন পরিহাসছলে বলেছিলেন, লঙ্কা দ্বীপ জয় করতে সৈন্যসামন্তর খুব একটা দরকার হয় না! নকল সৈন্য দিয়েও সম্ভব। চীনসম্রাটের সেই কথা আজ হাতেনাতে প্রমাণ হল। চীনসম্রাটের সঙ্গে লঙ্কেশ্বরের পরম মিতালী। তাই চীনরাজ্যের পক্ষে লঙ্কাজয় সম্ভব হল না। তবে চীন-সম্রাটের হারেমের রানীদের বড় শখ লঙ্কার একটি রাজপুত্র পোষেন। তাই একটি চীনা মেয়ে নকল বোম্বেটেদল সাজিয়ে লঙ্কার চোখে ধুলো দিয়ে, রাজধানীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তাদের রাজপুত্রকে নিয়ে চলে গেল। ইতি

চীনা মেয়ে ॥

পুনশ্চঃ লঙ্কাসম্রাট অর্ধেক রাজকোষ ছাড়তে যদি রাজী থাকেন তবে চীনা রানীদের শখ আপাতত মুলতুবী রেখে রাজপুত্রকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা দেখি!

চিঠির অক্ষরগুলি সম্রাটের চোখের সামনে নাচতে শুরু করল। সম্রাট রোষে ক্ষোভে চিঠিটা গালিচার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু কী ভেবে আবার কুড়িয়ে নিলেন। একবার, দুবার তিনবার চিঠিটা পড়লেন।

এদিকে বোম্বেটে দল উধাও হবার পর রাজধানী ক্রমশঃ তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। কে কোথা থেকে এসে একটা বিশ্রী তামাসা করে লঙ্কার মুখে চূণকালি দিয়ে গেল, এই বোধটা রাজ্যের হোমরাচোমরাদের হতে বিশেষ দেরি হল না। তখন রাজধানীর দিকে দিকে বিপদের নিশানা তোলা হল। সাবধানী ডঙ্কা বাজল। রাজপথ কাঁপিয়ে সশব্দে দলে দলে সৈন্য দশদিকে ছুটল। রাজপুত্রের শূন্য বিছানাটা পাহারা দেবার জন্য পর্যন্ত সৈন্য মোতায়েন করা হল।

সভাকবি মেঘবর্ণ সংবাদ পেয়ে প্রাসাদে ছুটে এসেছিলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি ও নগরপাল যখন মাথা হেঁট করে সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়ালেন, তখন চিন্তাকুল সম্রাটের কিছু তফাতে মেঘবর্ণ কী একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে ছিলেন। সম্রাট মন্ত্রীদের কিছু বলবার আগেই মেঘবর্ণ বললেন, "সম্রাট, এ-ব্যাপাবটা নিছক তামাসা বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না।" আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই হাস্যকর ব্যাপারটার আড়ালে কারো কোনো একটা কূট অভিসন্ধি আছে।

মন্ত্রী মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ব্যাপারটা এত হাস্যকর বলেই এত ভয়ঙ্কর ঠেকছে।"

"সেনাপতি আফশোষ করে বললেন, "সম্রাট, বিষয়টা বুঝবার আগেই সর্বনাশ হয়ে গেল। নাহলে—নাগালে পেতুম তো গোটা-দলটাকে কচুকাটা করতুম।"

নগরপাল কপালে করাঘাত করে বললেন, "আমার আর সম্রাটের দিকে মুখ তুলে তাকাবার পথ রইল না। আমি থাকতে কিনা—"

সম্রাট ক্লান্তস্বরে বললেন, "আপনারা যদি এখন হাহাকারের পালাটা চুকিয়ে মাথা-খাটানোর পালাটা শুরু করেন তাহলে হয়তো এখনও একটা পথ বার হয়।"

মন্ত্রী বললেন, "অর্ধেক রাজকোষের বিষয়টা নিছক তামাসা মনে হচ্ছে না।"

মেঘবর্ণ বললেন, "ঠিক। এই সাজানো ব্যাপারটায় অদ্ভুত বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় পাচ্ছি। লঙ্কার সম্মানে আঘাত দেওয়ার, অপমান করার এর চেয়ে চমৎকার ব্যবস্থা আর কী হতে পারে! আমার মতে ভেবে দেখা উচিত, সম্রাট, এমন কোন্ রাজ্য আছে যে প্রকাশ্যে লড়াইয়ে নামতে রাজী নয়, আড়াল থেকে লঙ্কার উপর চাপ দিতে চায়?"

সম্রাট বললেন, "তা কি সম্ভব, মেঘবর্ণ? চাপ দিয়ে যদি কিছু আদায় করতে হয় তো পাবার সময় হাত পাততেই হবে। তখন তো পরিচয় দিতেই হবে।"

মেঘবর্ণ বললেন, "আপনার রাজ্যের কোনো অংশের উপর কোনো রাজ্যের লোভ থাকলে শেষ পর্যন্ত তাকে সম্মুখে আসতেই হবে। কিন্তু আপনার রাজকোষের উপর যদি কারো চোখ পড়ে থাকে তাহলে নিজে আড়ালে থেকে অনায়াসে কারো মারফৎ দাবী দিয়ে, রাজকোষ ছিনিয়ে নিয়ে লোভ মেটানো চলে!"

সম্রাট কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর কাতরকণ্ঠে বললেন, "তাহলে এখন আমাদের কী কর্তব্য? প্রতিটি মুহূর্তে রাজপুত্র আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।"

সেনাপতি বললেন, "রাজধানীর আশেপাশে খুঁজে দেখা উচিত। যদি রাজধানীর বাইরেই কোথাও নকল বোম্বেটেরা রাজপুত্রকে নিয়ে লুকিয়ে থাকে—"

মন্ত্রী বললেন, "শত্রুর ধরাপড়ার ভয় আছে। রাজপুত্রকে নিয়ে সে কিছুতেই লঙ্কায় বসে থাকবে না।"

ক্ষিতিভূষণ

সম্রাট বললেন, "জলপথে ফিরে যাওয়া ছাড়া শত্রুর উপায় নেই। চিঠিতে চীনের উল্লেখ আছে। জানি না, এ-ও একটা প্যাঁচ কি না?"

মেঘবর্ণ বললেন, "লঙ্কার পশ্চিমে ভারত মহাসাগর জুড়ে কালীভূষণ টহল দিচ্ছে। শত্রু সেদিকটা এড়িয়ে চলবে। দলটা চীন কিম্বা অন্য যে-কোনো দেশ থেকেই আসুক না কেন ভারত-সাগরের পূব ঘেঁষে চীন সাগরের দিকেই আপাততঃ পালাবে। আমাদের সেদিকে নৌ-বহর পাঠিয়ে শত্রুকে বাধা দেওয়া দরকার।"

সম্রাট নিঃশব্দে শুনলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কালীভূষণের উদ্দেশে বারোটি পায়রা-র পা-য়ে চিঠি বেঁধে পশ্চিম দিকে ছেড়ে দেওয়া হল। তারা পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশঃ নিজেদের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে উড়ে চলল।

সম্রাটের মুখে এই অদ্ভুত বিবরণ শুনে কালীভূষণ প্রথমে স্তম্ভিত হল। সে ভাবছিল, নকল বোম্বেটে দিয়ে লঙ্কার রাজধানীর চোখে ধূলো দেওয়া যায়, কিন্তু তাদের ভরসায় চীনসাগর কিম্বা ভারতসাগর পাড়ি দেওয়া যায় না। সমুদ্রের এ অঞ্চলে বোম্বেটের ছড়াছড়ি। যে কোন মুহূর্তে বোম্বেটের আক্রমণ ঠেকাতে হতে পারে। নিতান্ত উন্মাদ না হলে শুধু নকল বোম্বেটে নিয়ে এখানে কেউ এক পা এগোতে সাহস পাবেনা। আসল নকল মেশানো এ একটা বিচিত্র দল। নকল বোম্বেটে দিয়ে ডাঙায় কাজ হাঁসিল করে আসল বোম্বেটে নিয়ে দরকার হলে সে মাঝদরিয়ায় লঙ্কার সঙ্গে লড়বে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "ঘটনার পর তিন তিনটে দিন কেটে গিয়েছে। শত্রু অনেকটা পথ চলে গিয়েছে। এখন তো সে তুড়ি মেরে রাজপুত্রকে নিয়ে উধাও হবে!"

সম্রাট বললেন, "তাহলে উপায়?"

কালীভূষণ বলল, "উপায় একটা বার করতেই হবে সম্রাট। নিরুপায় হয়ে লাভ কী?"

এই সময় মেঘবর্ণ সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন। মেঘবর্ণকে দেখে কালীভূষণ উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল। মেঘবর্ণ কালীভূষণের চিন্তাকুল মুখ দেখে হেসে বললেন, "একটা সুসংবাদ আছে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে এইমাত্র খবর নিয়ে এলাম চীনসাগর থেকে একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণিঝড় পাক খেতে খেতে ভারত মহাসাগরের দিকে আসছে। চীন সাগরমুখো যত জাহাজ এখন ভয়ে ভারত মহাসাগরে পালিয়ে আসবে।"

বসতে গিয়ে কালীভূষণ আবার উঠে দাঁড়াল। তার দুটো চোখ জ্বলে উঠল, অসুরের মতন ফুলে উঠে সে বলল, "তাহলে আর ভয় নেই, সম্রাট, রাজপুত্র আমাদের হাতের মুঠোয়। শত্রু বেশী দূর এগোতে পারেনি। রাত ভোর না হতে আমার অভিযান শুরু হবে।"

মেঘবর্ণ বললেন "রাজপুত্র এবং সেই সঙ্গে লঙ্কার সম্মান উদ্ধার না করা পর্যন্ত রাজসভায় আমার কাব্যও তেমন জমবে না। সম্রাট অনুমতি করুন, কালীভূষণের অভিযানে আমি তার সঙ্গী হই।"

সঙ্গে সঙ্গে মেঘবর্ণ ও কালীভূষণের মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হল। কালীভূষণ বলল, "অনুমতি করুন, সম্রাট। এ-অভিযানে সভাকবি আমার সঙ্গী হোন।"

৩

শেষ রাতের অন্ধকারে অভিযান শুরু হল। সম্মুখে কালীভূষণের ও মেঘবর্ণের জাহাজ, তার পিছনে ক্ষিতিভূষণের। বাকী জাহাজগুলি বেশ খানিকটা তফাতে আধখানা চাঁদের মতন একটা ব্যূহ রচনা ক'রে এগোতে লাগল। ভারত সাগরে তুফানের মতন হাওয়া দিচ্ছিল। সব কটা জাহাজ পাল তুলে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভেসে চলল।

প্রায় দু-দিন নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল। সমুদ্র একটু অশান্ত থাকা সত্ত্বেও দুর্যোগের তেমন কোন লক্ষণ ছিল না। আকাশ একটু আবছা, একটু ধোঁয়াটে, কিন্তু সেখানে ঝড়ের মেঘের লেশমাত্র ছিল না।

কালীভূষণের নৌবহর ফাঁকা সমুদ্রে একটা অতিকায় তিমির মতন তীরবেগে ছুটে চলল। দুচারটি সদাগরী জাহাজ দূরে দূরে একবার দেখা দিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিন মাঝরাতের পর তুফান হাওয়ায় একটা নতুন সুর বেজে উঠল। একটা তীক্ষ্ণধ্বনি পর্দায় পর্দায় চড়ে যেন একটা রাক্ষুসে বাঁশির সপ্তমে উঠে ফেটে ফেটে যেতে থাকল। পালের পর্দায় ঘা দিয়ে দিয়ে আওয়াজটা একটা ধারালো ছুরির ফলার মতন চারিদিকে আকাশ ও আলোর গায়ে বিঁধে যেতে লাগল। অনন্ত আকাশের অফুরন্ত আলোয় এই আওয়াজটা একটা আহত জানোয়ারের মতন চেঁচিয়ে ফিরল।

মাস্তুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কালীভূষণ আকাশ পাতাল কী ভাবছিল। জ্যোৎস্নারাতের আকাশে চাঁদ তখন পশ্চিমে হেলেছে। কিছুক্ষণ পরই তুফান হাওয়ায় উথলে ওঠা সমুদ্র তাকে লুফে নেবে। পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল। দেখল, সভাকবি মেঘবর্ণ কী ভাবতে ভাবতে তারই দিকে আসছেন। কালীভূষণের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মেঘবর্ণ বললেন, "মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাবলুম যাই, বাইরে গিয়ে একবার অকূল সমুদ্রের মাঝরাতের রূপটা দেখে আসি।"

কালীভূষণ বলল, "একটা যুগ ধবে সমুদ্রেব সঙ্গে আমার মিতালী। যখনই কাছে আসি, রক্তে নেশা ধরে। ডাঙার কথা ভুলে যাই। যখন খুনের খেলায় মাতি, তখন আমার রক্তের ভিতর সমুদ্রের গর্জন যেন শুনতে পাই। কিন্তু কী যে সে পেতে চায়, অর্থ টা আজ পর্যন্ত বুঝলুম না। আপনি তো কবি, আপনি হয়তো বোঝেন!"

মেঘবর্ণ ম্লান হেসে বললেন, "অর্থ তো একটা নয়, কালীভূষণ। যখন যে অর্থ মনে ধরে, তখনকার মতন সেইটেই হচ্ছে আসল অর্থ। যখন মনে আনন্দের অভাব নেই, তখন আমরা সমুদ্রের মাথায় চাঁদের মুকুট ও পায়ে ঢেউয়ের নূপুর পরিয়ে দিই। যখন মনে দুঃখের বোঝা চেপে বসে তখন মনে হয় সে যেন জলের কারাগারে বন্দী হয়ে হাহাকার করছে। আকাশের পানে ঢেউয়ে হাত তুলে মুক্তির জন্য মিনতি জানাচ্ছে।"

কালীভূষণ বলল, "আর যখন মনে খুনের নেশা চাপে?"

মেঘবর্ণ বললেন, "তখন মনে হবে সমুদ্র একটা ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছে, গ্রহ-নক্ষত্র ভরা অনন্ত আকাশকে ঢেউয়ের আগায় লুফে নিয়ে গ্রাস করতে চাইছে। তখন তাকে একটা লোভী দৈত্যের রূপ দিই। আসলে সব অর্থই মানুষের মনে। এজন্যই তো ভাবুক মানুষ নিজের মন খুঁজে খুঁজে তাকে জানবার চেষ্টায় হায়রাণ হয়ে

যায়। কিন্তু শিশুর মনে দ্বন্দ্ব নেই, অশান্তি নেই, সে বলবে সমুদ্র ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাতছানি দিয়ে পৃথিবীর খেলাঘরে আকাশকে ডাকছে। আকাশ সে-ডাকে সাড়া দিয়ে দিকে দিকে সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় নুয়ে পড়েছে। তাদের দুজনের এই মাতামাতি দেখে বাতাস বাঁশি বাজিয়ে কবির মনের কথা সকলকে বলছে।"

কালীভূষণ মুগ্ধ হয়ে মেঘবর্ণের মুখের পানে তাকাল। মেঘবর্ণ গুণগুণ করে গাইলেন ঃ

আজ আকাশ মিলিতে চায় সাগরে,
সাগর মিলিতে চায় আকাশে,
এ-কথা জানিল কবি কী করে
কথা বাঁশি হয়ে বাজে বাতাসে···

পিছনে দুমদুম একটা আওয়াজে মেঘবর্ণ ও কালীভূষণ দুজনেই চমকে উঠলেন। পিছন ফিরে তাকাতে দেখা গেল ক্ষিতিভূষণকে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দুজনকে সে লক্ষ্য ক'রে দেখছে।

চিরকাল ক্ষিতিভূষণ দাদার সঙ্গে একজাহাজে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। এবার আলাদা জাহাজের ব্যবস্থাটা ক্ষিতিভূষণের মনঃপূত হয়নি। দাদা তাকে তফাতে হটিয়ে দিল, এইরকম একটা অদ্ভুত ধারণা তার মনে খোঁচা দিচ্ছিল। সারাটা রাত নিজের জাহাজের পাটাতনে পায়চারি করে বেড়িয়ে ভোরের দিকে ডিঙ্গি করে এ-জাহাজে এসে দড়ির মই বেয়ে উপরে উঠে এসেছে। এসে দাদাকে মেঘবর্ণের সঙ্গে ঐ ভাবে কাব্য আলোচনা করতে দেখে সে তেতে লাল হল। মেঘবর্ণকে বিদ্রূপ করে বলল, "সভাকবি কি কবিতা গেঁথেই লড়াই ফতে করতে চান ?"

কালীভূষণ সবিস্ময়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল। মেঘবর্ণ চোখ টিপে কালীভূষণকে থামতে ইশারা করে ক্ষিতিভূষণকে বললেন, "এমন কবিও আছে ভাই যে কবিতাও লেখে আবার বোম্বেটেদের মতন তলোয়ারও চালায়।"

মেঘবর্ণ মাস্তুল থেকে তলোয়ারটার উপর
লাফ দিয়ে পড়লেন।

ক্ষিতিভূষণ কঠোরকণ্ঠে, বলল, "সভাকবির আপত্তি না থাকে তো হাতে নাতে তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক!"

মেঘবর্ণ হেসে বললেন, "বিলক্ষণ! সেইসঙ্গে কবিরা যে আবার খালি হাতেও কখনোসখনো আহাম্মক বোম্বেটেদের খোলা তলোয়ারের সঙ্গে লড়তে পারেন তার পরীক্ষাটাও হতে পারে।"

কালীভূষণ বাধা দেবার আগেই একটা হুঙ্কার দিয়ে ক্ষিতিভূষণ খোলা তলোয়ার হাতে মেঘবর্ণের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। মেঘবর্ণ যেন কুঁচো মাছের মতন পিছলে বার হয়ে গেলেন। ক্ষিতিভূষণ টাল সামলাতে না পেরে পাটাতনের ধারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উঠতে গিয়ে ক্ষিতিভূষণ দেখল মেঘবর্ণ মাস্তুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। কালীভূষণ খাপ থেকে তলোয়াব খসিয়ে বাধা দেবার আগেই ক্ষিতিভূষণ মহাবিক্রমে মেঘবর্ণের দিকে ছুটে গেল। মেঘবর্ণ অবলীলাক্রমে একটা হাল্কা লাফ দিয়ে মাস্তুল বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন! পিছু পিছু ক্ষিতিভূষণ উঠতে যেতেই তার কবজিতে পা দিয়ে অদ্ভুতভাবে একটা ধাক্কা দিলেন। ক্ষিতিভূষণের হাত থেকে তলোয়ারটা খানিকটা তফাতে পাটাতনের উপর ছিটকে পড়ল। বাজ যেমন শিকারের উপর ছোঁ মেরে পড়ে, মেঘবর্ণ মাস্তুল থেকে তলোয়ারটার উপর লাফ দিয়ে পড়লেন। ক্ষিতিভূষণ এসে পৌঁছবার আগেই তলোয়ারটা তুলে নিয়ে লড়াইয়ের ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন। তারপর চকিতে ক্ষিতিভূষণের বুকে আলগোছে একটা আঁচড় কেটে দিয়ে মেঘবর্ণ তলোয়ারটা কালীভূষণের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। ক্ষিতিভূষণ কারো পানে আর মুখ তুলে তাকাতে পারল না। তার মাথা আস্তে আস্তে হেঁট হয়ে এল। বিষয়টা লঘু করে দেবার জন্য মেঘবর্ণ ক্ষিতিভূষণের পানে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "কবির পক্ষে তলোয়ার চালানো অসম্ভব নয়, পরীক্ষা হয়ে গেল। বোম্বেটের পক্ষে কবিতালেখা সম্ভব কিনা সেই পরীক্ষাটা এবার হয়ে যাক। বাঁধো দেখি একটা ছড়া।"

কালীভূষণ বলল "থাক! ছড়া বেঁধে কাজ নেই। বোকামীর চূড়ান্ত হয়েছে। এখন সভাকবির পায়ের ধূলো নে।" তার কথায় তিরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের প্রতি একটা নিবিড় স্নেহ ও মমতা প্রকাশ পেল।

ক্ষিতিভূষণ মেঘবর্ণের দিকে এগোতেই মেঘবর্ণ তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে বললেন, "থাক! থাক! জীবনে হারজিত আছেই। যে রুখে দাঁড়াতে জানে সেই সত্যিকারের বীর।"

ক্ষিতিভূষণ নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। সে হাসবে কি কাঁদবে বুঝে উঠতে পারছিল না। আড়চোখে কালীভূষণ ও মেঘবর্ণকে দেখে নিয়ে তারপর সে হেসে ফেলল। বলল, "আমার কপাল ভালো শেষরাতে জাহাজের পাটাতনে ভিড় নেই। এই লাঞ্ছনা সকলের সামনে হলে আর মুখ দেখাতে পারতুম না!" তারপর গলা চড়িয়ে বলল—"দাদা, এবারের মতো তোমার ব্যবস্থা মেনে নিলুম। ভবিষ্যতে যদি তোমার কাছ থেকে সরিয়ে আলাদা জাহাজে দাও তো একটা ভীষণ হেস্ত নেস্ত করব।" এই বলে একগাল হেসে সে জাহাজের উপর থেকে নীচেয় বাঁধা তার ডিঙ্গিটায় লাফ দিয়ে পড়ল। তার হেঁড়ে গলার একটা বিকট বোম্বেটে গান আকাশে পাক দিয়ে উঠে মিলিয়ে গেল।

ক্ষিতিভূষণ আবার এল। কালীভূষণ ও মেঘবর্ণ তখন জাহাজের সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখছেন দূর দিগন্তে ঢেউয়ের মাথায় একটি মসীবিন্দু উঠছে পড়ছে। এ কি অতিকায় কোনও তিমি না বোম্বেটে জাহাজ! ক্ষিতিভূষণ তার হাতের দূরবীনটা কালীভূষণকে দিয়ে বলল, "চক্ষুর সন্দেহ ভঞ্জন করো দাদা। আমরা শিকারের কাছে এসে পড়েছি।"

কালীভূষণ দূরবীন কষল। পরে দূরবীনটা মেঘবর্ণের হাতে দিয়ে বলল, "তাহলে আজ রাতেই লড়াই সুরু হবে।"

মেঘবর্ণ দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে বললেন, "জাহাজটা কিন্তু আমাদের দিকেই আসছে।"

কালীভূষণ বলল, "জাহাজের পিছনে নিশ্চয়ই ঘূর্ণি ঝড় এগিয়ে আসছে। এ-অবস্থায় তার এদিকে না এসে উপায় নেই।" ক্ষিতিভূষণ তার তলোয়ারের খাপে হাত বুলোতে লাগল। কালীভূষণ হেসে বলল, "আর বেশী দেরী নেই ক্ষিতি। তলোয়ার খোলার সময় হল।"

৪

রাজপুত্র কণ্ঠে বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন, "কী চমৎকার ব্যবহার তোমাদের বলো তো! প্রাসাদে বীণার ঝঙ্কার শুনতে শুনতে ঘুম ভাঙতো। মুখ ধুয়ে সাজসজ্জা না করতেই ঘটা করে ভূরিভোজ শুরু হ'ত। নাঃ, তোমাদের হাতে পড়ে অসুবিধার চূড়ান্ত হল। এত জানলে বিছানায় শুয়ে শুয়েই লড়াই করতুম।"

রাজপুত্র যার উদ্দেশে এই কথা বললেন, কামরার দেয়াল-আলোয় তার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল। এ-রকম অনিন্দ্য-সুন্দর পুরুষ বুঝি চোখে পড়ে না। কিন্তু তবু তাব কোথায় যেন একটা কঠোরতা আছে। গোলাপে কাঁটার মতো এই কঠোরতা যেন তাকে অসাধারণ করে তুলেছে। রাজপুত্রেব কথার জবাবে সে বলল, "মাঝদরিয়ায় সুব্যবস্থাও অব্যবস্থা হয়ে পড়ে, রাজপুত্র! আমাদের পিছনে ঘূর্ণিঝড় এগিয়ে আসছে। ঝড় কখন এসে পড়ে ঠিক নেই। বোম্বেটেরা এখন জাহাজ সামাল দেবার আয়োজনে ব্যস্ত।"

রাজপুত্র ভ্রুভঙ্গী করে বললেন, "তোমার চেহারা দেখে মনে হয় তুমি বড় ঘরের ছেলে, অভাবে পড়ে বোম্বেটে হয়েছো।"

লোকটি হেসে বলল, "ভুল হল রাজপুত্র। অভাবে নয় স্বভাবে।"

রাজপুত্র আঁতকে উঠে বললেন, "স্বভাবে? আশ্চর্য তো?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ রাজপুত্র। ছেলেবেলা থেকেই বোম্বেটেদের কীর্তিকাহিনী পড়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে সুরু করি।

শেষে সংসর্গদোষে যা হয়, সখের বোম্বেটেগিরি করতে গিয়ে অবশেষে পেশাদার বোম্বেটে হয়ে পড়ি।"

হঠাৎ কামরাটা যেন দুলতে লাগল। রাজপুত্র বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "ব্যাপার কী? ভূমিকম্প নাকি?"

লোকটি হেসে বলল, "জলে আর ভূমিকম্প কী করে হবে, রাজপুত্র! নিশ্চয়ই ঘূর্ণিঝড়ের একটা ঝাপটা এসে জাহাজের গায়ে লেগেছে।"

রাজপুত্র বললেন, "জাহাজডুবির ভয় নেই তো!"

"না, ঝড় এড়ানোর জন্য আমরা যেদিক থেকে এসেছি সেই দিকেই ফিরছি। ঝড়টা আমাদের বাঁয়ে রেখে বর্মা মুলুকের দিকে মোড় নিয়েছে।"

"সবাই মিলে একেবারে লঙ্কায় ফিরলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।" রাজপুত্র বললেন।

লোকটি হেসে বলল, "আমাদের দুজনের একসঙ্গে লঙ্কা-ফেরা সম্ভব নয়, রাজপুত্র। অদৃষ্ট তোমাকে আব আমাকে উল্টোটানে টানছে। হয় তুমি ফিরবে, নয় আমি।"

লোকটি চলে যাচ্ছিল। রাজপুত্র পিছন থেকে ডেকে বললেন, "শোনো, কথা আছে।"

লোকটি কাছে এসে দাঁড়াতে বাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার বদলে সম্রাটের কাছে তোমরা কী চেয়েছো?"

"অর্ধেক রাজকোষ।" লোকটি হেসে বলল।

রাজপুত্র চিন্তা করে বললেন, "এ কিন্তু তোমাদের অন্যায় জুলুম! তোমাদের অর্ধেক রাজকোষ দিলে রাজ্য কী করে চলবে?"

লোকটি এবার গম্ভীর হয়ে বলল, "কেন, সরকারী বোম্বেটে কালীভূষণ আবার রাজকোষ ভরে দেবে।"

"তোমরা এত টাকা নিয়ে কী করবে?" রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

"যারা পেটের দায়ে বোম্বেটে হয়েছে তাদের খানিকটা দেবো। বাকীটা দিয়ে নবাবী করব, সখ মেটাবো।" লোকটি বলল।

"তোমাদের মেয়ে-সর্দারটিকে আর দেখছিনা কেন? সে কোথায়?" রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

"সে কখন কোথায় থাকে কেউ জানেনা। কিন্তু কেন, তাকে দিয়ে তোমার কী প্রয়োজন?" লোকটি সবিস্ময়ে বলল।

"সেই তো দলবল নিয়ে আমায় লুট করে নিয়ে এলো। এরকম অদ্ভুত মেয়ে কখনো দেখিনি। একটু যেন পুরুষ-পুরুষ ভাব। মেয়েদের পক্ষে এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।" রাজপুত্র গম্ভীর চালে বললেন।

রাজপুত্র আবার কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় জাহাজটা ভীষণ দুলে উঠল। চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। লোকটি ছুটে বার হয়ে গেল।

৫

সারাটাদিন কালীভূষণের নৌবহর ঘূর্ণিঝড়ের তুফান হাওয়া সামাল দিয়ে তিল তিল করে এগলো। ঘূর্ণিঝড় এড়ানোর জন্য শক্রকে পিছন হটে আসতে হচ্ছে। কিন্তু তাকে বেশী পিছনে হটতে দেওয়া নয়। ঘূর্ণিঝড় পিছনে থাকলে শক্র লড়াইয়ের সময় বেশীটা পিছনে হটতে পারবে না। সহজেই তাকে কোণঠাসা করা যাবে।

দুপুরের আগেই আরো কয়েকটা বিন্দু দিগন্তে ফুটে উঠল। বিকেলের দিকে দেখা গেল পালমাস্তুল সমেত ন-খানা জাহাজ ঝড়ের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসছে। কালীভূষণ বারোখানা জাহাজ নিয়ে রওনা হয়েছিল। ন-খানা জাহাজ দেখে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে অন্ততঃ বিশ-ত্রিশখানা জাহাজের সঙ্গে লড়বে ভেবেছিল!

কালীভূষণ দলের ন-খানা জাহাজকে শক্র জাহাজের দূরবীণের পাল্লার বাইরে পিছনে চলে যেতে হুকুম দিল! তিনখানা জাহাজ নিয়ে সে ন-খানা জাহাজ লক্ষ্য করে এগোতে লাগল।

শক্রজাহাজগুলি যখন ঘণ্টাখানেক পথের ভিতর এসে পড়ল, কালীভূষণ মেঘবর্ণ ও ক্ষিতিভূষণকে নিয়ে মন্ত্রণাসভায় বসল। কালীভূষণ বলল, "আমাদের মনে রাখতে হবে শক্র নকল-বোম্বেটে নয়। সে ধূর্ত এবং চতুর। সে কখন কোন্ চাল চালে ঠিক নেই।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের চলতে হবে—যতক্ষণ না রাজপুত্রকে ফিরে পাচ্ছি।”

মেঘবর্ণ বললেন, “শত্রুদের সর্দারণী সম্বন্ধে আমার মনে একটা খটকা বেধেছে।”

ক্ষিতিভূষণ বলল, “মেয়ে-বোম্বেটের কথা তো কস্মিনকালে শুনিনি।”

কালীভূষণ বলল, “গোঁফকামানো মেয়েও হতে পারে তো!”

কালীভূষণের মুখে গোঁফকামানো মেয়ের কথাটা শুনে মেঘবর্ণ চমকে উঠলেন। কালীভূষণকে পরমুহূর্তে গভীর চিন্তামগ্ন হতে দেখে তাঁর মনের সন্দেহটা গভীরতর হল। মেঘবর্ণ কালীভূষণের কাছে সরে গিয়ে তার কানে ফিস ফিস করে কী বললেন।

কালীভূষণ ও মেঘবর্ণের ভিতর কী একটা কথা হয়ে গেল বুঝতে না পেরে ক্ষিতিভূষণ বিরক্ত হল। কিন্তু মুখে কোনও অসন্তোষ প্রকাশ করল না। মেঘবর্ণ ক্ষিতিভূষণের মনোভাব আঁচ করে নিয়ে বললেন, “এই বিষয়টা নিয়ে পরে ক্ষিতিভূষণের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। আপাতত আলোচনাটা মুলতুবী থাক। সময় হয়ে এলো। কিন্তু এই তিনখানা জাহাজ নিয়ে ন-খানা জাহাজ তুমি কী কৌশলে ঠেকাবে কালীভূষণ, বুঝতে পারছি না।”

কালীভূষণ বলল, “আমরা অকুতোভয়ে এগিয়ে গিয়ে হয় চেঁচিয়ে, নয় নিশানায়, নয় তো দূত পাঠিয়ে বলব—‘আমরা অর্ধেক রাজকোষ নিয়ে এসেছি, আপোষ করতে চাই। কিন্তু রাজপুত্রকে যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ রাজকোষ হাতছাড়া করব না।’ মাত্র তিনখানা জাহাজ নিয়ে আমাদের এগোতে দেখলে শত্রুর মনে এ-ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে আমরা হার মেনে নিয়েছি। আপোষের সর্ত পালন করে রাজপুত্রকে ফিরিয়ে নিতে আসছি। আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।”

মেঘবর্ণ বললেন, “তারা যদি রাজকোষ দেখতে চায়!”

কালীভূষণ বলল, "দেখাবো।"

মেঘবর্ণ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "সে কি ? কোথায় রাজকোষ ?"

কালীভূষণ বলল, "আসবার সময় অর্ধেক রাজকোষ নিয়ে এসেছি।"

মেঘবর্ণ অস্ফুট স্বরে অবিশ্বাসভরে বললেন, "সম্রাটের অজ্ঞাতসারে অর্ধেক রাজকোষ নিয়ে এসেছো! তাও কি সম্ভব ?"

কালীভূষণ স্বাভাবিককণ্ঠে বলল, "অসম্ভব সম্ভব হল তলোয়ারের খোঁচায়। রক্ষীরা হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় দুটি বোম্বেটের হেফাজতে কোষাখানায় আরাম করছে। যতক্ষণ না রাজপুত্রকে নিয়ে ফিরছি ততক্ষণ তারা আরাম করতে থাকবে। ব্যাপারটা সুগোপনে করতে হয়েছে। রাজপুত্রকে সম্রাটের হাতে তুলে দিয়ে তারপর দোষ কবুল করব।"

মেঘবর্ণ বললেন, "রাজকোষ নিশ্চয়ই হাতছাড়া করছ না ?"

কালীভূষণ বলল, "প্রাণ গেলেও না।"

মেঘবর্ণ বললেন, "কিন্তু রাজকোষ না দিয়ে ন-খানা জাহাজের কবল এড়িয়ে রাজপুত্রকে নিয়ে কী করে তুমি সরে পড়বে, বুঝতে পারছি না।"

কালীভূষণ হেসে বলল, "তার জন্যে দুটো রাজকোষ দরকার—একটা আসল, আর একটা নকল। উদ্দেশ্য আসলটা দেখিয়ে রাজপুত্রকে হাতকরার পর নকলটা পাঠিয়ে শত্রুর ভুল ভাঙবার আগেই রাজপুত্র ও আসল রাজকোষ নিয়ে সরে পড়া। রাজপুত্র যে-জাহাজে রাজ্যে ফিরবেন, তার খবরদারী আপনার। আসল রাজকোষ যে-জাহাজে আছে, তার খবরদারী ক্ষিতিভূষণের। রাজপুত্রকে আপনার হাতে সঁপে দিয়ে ক্ষিতিভূষণকে আপনার পিছু নিতে বলে, নকল রাজকোষ নিয়ে আমি শত্রুর চোখে ধুলো দিতে যাবো"।

মেঘবর্ণ বললেন, "তুমি একা ন-খানা জাহাজের উপর টেক্কা দিতে যাবে ?"

সর্দারণী

কালীভূষণ বলল, "রাজপুত্রকে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনারা পাল তুলে রওনা হয়ে যাবেন। আগে ভাগেই ব্যবস্থা হয়েছে, আমাদের যে ন-খানা জাহাজ আড়ালে অপেক্ষা করছে তারা যে-মুহূর্তে দূরবীণে আপনাদের এগোতে দেখবে, বুঝবে যে কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। তারা তখন এগিয়ে আসবে। যদি ভালোয় ভালোয় শত্রুর চোখে ধূলো দিয়ে ফিরতে পারি, তারা আমার সঙ্গে ফিরবে। যদি ধরা পড়ি, তারা যেভাবেই হোক শত্রুর উপর চড়াও হয়ে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। যদি তা সম্ভব না হয় তারা আমার সঙ্গে শত্রুকে শেষ করে তবে শেষ হবে।"

মন্ত্রণাসভা শেষ হল।

বোম্বেটে জাহাজগুলো কাছাকাছি এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল একটা জাহাজকে মাঝখানে রেখে দুদিকে চারটা করে জাহাজ কালীভূষণের তিনটে জাহাজকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল। কালীভূষণের বুঝতে বাকি রইল না যে মাঝের জাহাজটাই সর্দারণীর, এবং রাজপুত্রও সেই জাহাজেই আছেন। জাত-বোম্বেটে কালীভূষণ বোম্বেটেদের হালচাল জানে। সে জানে এদের রক্তে আছে বড়াই করবার, ঢাক-পিটোনোব নেশা। ফন্দি আঁটতে এরা যেমন ওস্তাদ, তেমনি নিজেকে জাহির করার শিশুসুলভ দুর্বলতাও এদের চরিত্রে প্রবল।

কালীভূষণ প্রথমে শিঙা ফুঁকে তার উপস্থিতিটা জানাল। তার এ-শিঙা বিখ্যাত। আরবসাগর, ভারতসাগর ও চীন সাগরে এ-শিঙার আওয়াজ কারো অজানা ছিল না। কালীভূষণের শিঙার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মাঝখানের জাহাজের মাস্তুলে ফরফর করে একটা নিশান উঠল। এ-নিশান দুর্ধর্ষ চীনা বোম্বেটে চিংয়ের। সঙ্গে সঙ্গে মহা

আড়ম্বরে চিং তাঁর জাহাজের সম্মুখ দিকে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বিশাল দেহে জমকালো পোষাক ঝলমল করছে। চিং স্মিতমুখে কালীভূষণের উদ্দেশে অভিবাদন জানালেন। উত্তরে কালীভূষণ হাতের খোলা তলোয়ারটা একবার আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল। এই অপূর্ব অভিবাদনে চিংয়ের মুখ হাসিতে ভরে গেল।

কালীভূষণ চোঙায় মুখ রেখে চেঁচিয়ে বলল, "বোম্বেটে ধুরন্ধর চিং, আপনার দু-পাশের জাহাজগুলো আমার তিন জাহাজের সামান্য নৌবহর ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। আমি লঙ্কাসম্রাটের তরফে বন্ধুভাবে আপোষের সর্ত পালন করতে এসেছি। এ-ক্ষেত্রে এদের যুদ্ধের কায়দা ছাড়তে বলুন। আমার নৌবহর ঘেরাও হলে আমি আমার নৌবহরে আগুন দিয়ে লড়াই করে মরব। আপোষে এগবো না।"

বোম্বেটে সর্দার চিংয়ের মুখ চিন্তাকুল হল। তিনি চোঙায় মুখ রেখে চেঁচিয়ে বললেন যে তিনি নামেই মাত্র দলের সর্দার। হ্যাঁ-না বলার মালিক হচ্ছেন দলের সর্দারণী। সর্দারণী এখনই এসে তাঁর হয়ে জবাব দেবেন।

এই সময় চিংয়ের জাহাজে একটা সাড়া পড়ে গেল। বোম্বেটেরা সবাই দু-ভাগ হয়ে পথ করে দিল। মহাদাপটে এক রণরঙ্গিণী মূর্তি এসে চিংয়ের পাশে দাঁড়াল।,

প্রথমে চিংয়ের সঙ্গে সর্দারণীর কী কথা হল। তারপর সর্দারণী চোঙায় মুখ দিয়ে বললেন, "কালীভূষণ যদি বোম্বেটে জাহাজ দেখে ভয় পেয়ে থাকেন তবে বিনাসর্তেই আমরা জাহাজগুলোকে নিরস্ত হতে বলছি। তবে আপোষে আমাদের কোনই আপত্তি নেই। অর্ধেক রাজকোষ বুঝিয়ে দিয়ে কালীভূষণ স্বচ্ছন্দে রাজপুত্রকে নিয়ে যেতে পারেন।"

কালীভূষণ জবাবে বলল, "রাজপুত্রকে ফিরে পেলে তৎক্ষণাৎ রাজকোষ আপনার জাহাজে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।"

চিং ও সর্দারণীর ভিতর আবার খানিকটা আলোচনা হল। তারপর সর্দারণী বললেন, "যতক্ষণ না রাজকোষ যাচাই করা যাচ্ছে ততক্ষণ রাজপুত্রকে ফিরিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে না! আগে রাজকোষ যাচাই হোক।"

কালীভূষণ জবাবে বলল, "আপনাদের এ-প্রস্তাবে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

সর্দারণী বললেন, "রাজকোষ আমাদের জাহাজে পৌঁছে দিন। তাতে করে আমাদের পক্ষে যাচাই করতে সুবিধে হবে। রাজকোষ খাঁটি প্রমাণ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রকে আপনাদের হাতে তুলে দেবো।"

কালীভূষণ বলল, "লঙ্কার রাজকোষ লঙ্কার জাহাজে এসে যাচাই করুন। আমাদের সম্রাটকে অন্ততঃ এই সৌজন্যটুকু দেখান।"

সর্দারণী এবার কঠোরকণ্ঠে বললেন, "নকল রাজকোষ সমুদ্রের জলে ফেলে দিন। আসল রাজকোষ তখন যাচাই করবার প্রয়োজন হবে না। আসল রাজকোষ যদি মাটির ঢেলাও হয়, লঙ্কাসম্রাটের মর্যাদার খাতিরে তাই আমরা আসল বলে মাথায় তুলে নেবো।"

কালীভূষণের সঙ্গে সর্দারণীর কথাবার্তার ধরণটা মেঘবর্ণের সুবিধের ঠেকছিল না। কালীভূষণের পাশে এসে বললেন, "সর্দারণী কঠিন চাল চেলেছে। নকল রাজকোষ জলে ফেলে দিলে তখন আসল রাজকোষ শত্রুকে না দিয়ে পারা যাবে না। আর আসল রাজকোষ তো সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া যায় না। মাথা খাটাও, কালীভূষণ।"

কালীভূষণ চোঙায় মুখ রেখে বলল, "আপনার এ-কথার কী জবাব দেবো! আপনার অসঙ্গত উক্তি সম্রাটের মর্যাদায় ঘা দিচ্ছে। রাজপুত্র আপনাদের হাতে। এ-অবস্থায় সম্রাটের হয়ে আমি প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কী করতে পারি! আপনাদের রাজ্যে কী

চিং সর্দার

ব্যবস্থা জানিনা কিন্তু লঙ্কার রাজকোষ একটাই আছে। তাই আপনাদের মুখে আসল ও নকলের কথা শুনে স্তম্ভিত হলুম। রাজপুত্রকে হয়তো ফিরিয়ে দেওয়া আপনাদের ইচ্ছে নয়। তাই এই আসল-নকলের কথা তুলছেন।"

কালীভূষণ যতক্ষণ থেমে থেমে ভণিতা করে কথা বলছিল, সেই ফাঁকে গুঁড়ি মেরে অসুর ক্ষিতিভূষণ তার জাহাজ থেকে আসল রাজকোষের সিন্দুকটা নিয়ে দড়ির মই বেয়ে ডিঙিতে নামল। সিন্দুকটা ডিঙির খোলে রেখে তার উপর পাল ও বৈঠা চাপা দিয়ে ডিঙিটা আরো শক্ত করে সে জাহাজের গায়ে বেঁধে দিল।

সর্দারণী চিংয়ের সঙ্গে খানিকক্ষণ পরামর্শ করে বললেন, "কিন্তু আমাদের কাছে খবর এসেছে আপনাদের দু-জাহাজে দুটো রাজকোষ এসেছে, তার ভিতর একটা হচ্ছে নকল। এই নকলটা জলে ফেলে দিলে আপদ চুকে যায়। আমরা নিশ্চিন্ত মনে বাকী রাজকোষটাকে আসল বলে নিতে পারি।"

কালীভূষণ এবার হেসে বলল, "আমাদের সম্রাট রাজকোষের পরোয়া করেন না। তার দাসানুদাস আমারও ধনদৌলতে আসক্তি নেই। আমার জাহাজে একটা রাজকোষই আছে। আপনাদের খুশী করতে আমি অনায়াসেই আসল রাজকোষ জলে বিসর্জন দিতে পারি। কিন্তু তাহলে কথা দিন, শুধু হাতে রাজপুত্রকে ফিরিয়ে দেবেন। আপনাদের কথা পেলে আমি হাসিমুখে এখনই রাজকোষ জলে ফেলে দিচ্ছি।"

মেঘবর্ণ হেসে বললেন, "সাবাস, কালীভূষণ! দেখি সর্দারণীর ঘটে কত বুদ্ধি! তোমার চালের জবাবে এবার কী চাল চালে!"

সর্দারণী এবার বললেন, "আমরা এ-বিষয়ে পরামর্শ করে ঘণ্টা খানেক বাদে জবাব দেবো। এই সময়টাতে যে-জাহাজ যেখানে ছিল, সেখানেই থাকবে।"

শত্রুদের যে-কটা জাহাজ কালীভূষণদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা

করছিল, তারা ততক্ষণ খানিকটা সরে গিয়েছিল। কালীভূষণের মুখ খুশিতে ভরে গেল।

কালীভূষণের নৌবহরে গুপ্তচর ছিল পাঁচটি। এদের ভিতর সবচেয়ে ধূর্ত ও দুঃসাহসী ছিল জয়রত্ন। তাকে সর্দারণীর জাহাজে পাঠানো হল।

গোয়েন্দা জয়রত্ন কিছুক্ষণের ভিতরই একটা ভাঙা ডিঙির পুরণো কয়েকটা তক্তা একসঙ্গে বেঁধে একটা ভেলা তৈরী করে সমুদ্রে নেমে পড়ল। খানিকবাদে সর্দারণীর জাহাজের পিছনে একটা কোলাহল শোনা গেল। একদল বোম্বেটে হৈ চৈ করে সেদিকে গিয়ে দেখল জয়রত্ন ভেলাটা আঁকড়ে ধরে হাঁপাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হল সে দীর্ঘকাল অনাহারে রয়েছে, যে কোন মুহূর্তে মূর্ছা যেতে পারে।

জয়রত্নকে লক্ষ্য করে একটি বোম্বেটে একপাক দড়ি ছুঁড়ে দিল। দড়ি ধরতে গিয়ে ক্লান্তিতে অবসাদে বার বার জয়রত্নের হাত যেন শিথিল হয়ে যাচ্ছিল। শেষে কোনরকমে দড়ি ধরে সে হাঁপাতে হাঁপাতে জাহাজে উঠে এল। টলতে টলতে সে পাটাতনের উপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর দুধ ও আরক খানিকটা পেটে যেতে সে যেন একটু চাঙা হয়ে উঠল। জাহাজে খবর রটে গেল ঘূর্ণিঝড়ে এক সদাগরী জাহাজ তিনদিন আগে জলডুবি হয়েছে। তিনদিন তিনরাত অকূল সমুদ্রে একটা ভাঙা ভেলায় ভেসে এসে সেই জাহাজের একটি লোক—নাম জয়রত্ন—এই জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে।

সর্দারণীর কাছেও খবরটা গেল। তিনি কিন্তু সন্দিগ্ধ হলেন। কী ভেবে লোকটাকে তাঁর কামরায় নিয়ে আসতে বললেন। কামরায় মেঝের উপর একটা চাদর পেতে বোম্বেটেরা জয়রত্নকে শুইয়ে দিয়ে চলে গেল।

৬

সর্দারণী কামরার কবাটটা বন্ধ করে বললেন, "তুমি কে? কী মতলবে এখানে এসেছো?

জয়রত্ন উঠে বসে মুচকি হেসে বলল, "অপরাধ নেবেন না। আমি মিছে কথা বলে এই জাহাজে উঠেছি। আসলে আমি কালীভূষণের দলের লোক। আজ কালীভূষণ যখন মন্ত্রণাসভায় তার দলের লোকদের সঙ্গে বসে গোপনীয় আলোচনা করছিল, তখন পাটাতনের তলায় আমি জাহাজের খোলে কাজ করছিলুম। পাটাতনে ফাঁক ছিল। আমার কৌতূহল হল। আমি কাজ থামিয়ে তাদের কথা শুনতে লাগলুম, তাতে ভয়ে আমার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল। মোটকথা কালীভূষণ শুধু আপনাদের নয়, তার মনিব অর্থাৎ লঙ্কার সম্রাটকেও ঠকাতে চায়।"

সর্দারণীর কৌতূহলে ইন্ধন পড়ল। বললেন, "তোমার কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কালীভূষণ তো ঠক জোচ্চোর নন।"

জয়রত্নর প্রাণ তার মুখে এসে ঠেকল। বলল, "আমারও গোড়ায় সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু যা কানে শুনেছি তা অবিশ্বাস করি কী করে!"

সর্দারণী বললেন, "কী শুনেছো, বলো।"

জয়রত্ন বলল, "কালীভূষণ আপনাদের সঙ্গে আপোষের ব্যাপারে একটা গোলমাল বাধিয়ে রাজকোষ নিয়ে সরে পড়তে চায়।"

সর্দারণী মাথা নেড়ে বললেন, "অসম্ভব। তাহলে তো রাজপুত্র আমাদের হাতে বন্দী থেকে যাবে।"

জয়রত্ন বলল, "কালীভূষণ তাই-ই চায়। তার লক্ষ্য এখন রাজপুত্র নয়—রাজসিংহাসন। রাজকোষ বিলিয়ে সারা রাজ্যটা হাতের মুঠোয় এনে এই গোলমালের সুযোগে সে লঙ্কার সিংহাসন দখল করতে চায়।"

সর্দারণী চমকে উঠলেন। মুহূর্তে তাঁর দু-চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে এল। তাঁর ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল। মুখ অন্ধকার হয়ে এল। কয়েক মুহূর্ত একটা পাথরের প্রতিমার মতন সর্দারণী নিশ্চল হয়ে রইলেন। তারপর কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজকোষ কার জাহাজে আছে?"

জয়রত্ন বলল, "কালীভূষণের জাহাজে।"

সর্দারণী জিজ্ঞাসা করলেন, "আর নকল রাজকোষ?"

জয়রত্ন কয়েকটা ঢোক গিলে বলল, "কী আশ্চর্য! নকল রাজকোষের খবর কী করে আপনার কাছে পৌঁছাল! এই রাজকোষ আছে ক্ষিতিভূষণের জাহাজে। কিন্তু কালীভূষণের এমনই বুদ্ধি কৌশল, ক্ষিতিভূষণের ধারণা আসল রাজকোষ তার জাহাজেই আছে।"

সর্দারণী বললেন, "তুমি ধরা পড়লে কী করে?"

জয়রত্ন বলল, "কালীভূষণের গুপ্তচর আমাকে কাজ থামিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে কথা শুনতে ছাখে। সে কালীভূষণকে গোপনে সংবাদ দেয়। টের পেয়ে মৃত্যু অনিবার্য জেনে আমি প্রাণ হাতে করে সমুদ্রে নেমে পড়ি।"

সর্দারণীর ভ্রুকুঞ্চিত হল। বললেন, "তোমার আর কিছু বলার আছে?"

জয়রত্ন হাতজোড় করে সকাতরে বলল, "আমায় এভাবে সকলের মাঝে ছেড়ে দেবেন না। কালীভূষণের অসাধ্য কিছুই নেই। সে

যে কোনো সময়ে গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে কিম্বা আপনারই কোনো লোককে হাত করে আমার ইহলীলা ঘুচিয়ে দিতে পারে। আমায় রক্ষা করুন। আমি আপনাকে যে-সংবাদ দিয়েছি, তা যতই অসম্ভব মনে হোক, যদি একবর্ণও মিথ্যা প্রমাণ হয়, আমাকে যে কঠোর শাস্তি দিতে হয় দেবেন। এমন কি, আমায় যদি মাঝসমুদ্রে হাত-পা বেঁধে ফেলেও দেন, আমার কিছু বলার থাকবে না।"

সর্দারণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জয়রত্নের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখলেন। তারপর কঠোরস্বরে বললেন, "বেশ, তাই হবে।"

সর্দারণীর হুকুমে জয়রত্নকে রাজপুত্রের কামরায় রাজপুত্রের নফর হিসাবে বন্দী করা হল।

লঙ্কার নৌবহর দৃষ্টিগোচর হবার পর থেকেই রাজপুত্রের কামরায় পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবার সর্দারণী তাঁর চারটি ঘুঘু গোয়েন্দা বোম্বেটেকে কামরার পাহারায় বহাল করলেন। রাজপুত্র ও জয়রত্নের ভিতর অবাধ মেলামেশায় বাধা দিতে তাদেরকে নিষেধ করলেন। কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখে তাদের উপর কড়া নজর রাখতে বললেন।

জয়রত্ন মস্ত একটা সেলাম দিয়ে রাজপুত্রের সম্মুখে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল। রাজপুত্র বললেন, "তুমি আবার কে? তোমায় তো আগে দেখিনি।"

জয়রত্ন ললাটে করাঘাত করে মেঝেয় বসে পড়ে বলল, "আমি আপনার দাসানুদাস। লঙ্কার সরকারী বোম্বেটেদের একজন।"

রাজপুত্রের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "আমাকে উদ্ধার করতে এসে ধরা পড়েছো বুঝি?"

জয়রত্ন কাতরকণ্ঠে বলল, "রাজপুত্র, ভুল বুঝবেন না। অদৃষ্টের চক্রান্তে আজ আমায় এখানে এসে ধরা দিতে হয়েছে। ধরা না দিলে লঙ্কার মান-মর্যাদা পথের ধুলোয় লুটোত। শত্রুর হাতে

আপনাকে বন্দী থাকতে হোত। বিশ্বাসঘাতক কালীভূষণ অর্ধেক রাজকোষ নিয়ে মাঝ-দরিয়ায় উধাও হোত।"

রাজপুত্র ভয়ে বিস্ময়ে কোনও কথা বলতে পারলেন না। জয়রত্ন সুযোগ পেয়ে বলল, "বোম্বেটের কাছে দেশ ধর্ম কিছু নয়, রাজপুত্র। বোম্বেটেরা সৃষ্টিছাড়া মানুষ। তার রক্তে আছে খুন ও লুটের নেশা। ঐ লুটের নেশায় মেতে কালীভূষণ দেশদ্রোহী হতে বসেছে। সে ফন্দি এঁটেছে আপনাকে শত্রুর হাতে রেখে আজ রাতে অর্ধেক রাজকোষ নিয়ে উধাও হবে।"

রাজপুত্র কিছুক্ষণ নীরব থেকে পরে বললেন, "কালীভূষণের অভিসন্ধির কথা আর কে কে জানে?"

"মেঘবর্ণ ক্ষিতিভূষণ জানে। কিন্তু তারাও যতদূর মনে হয় কালীভূষণের দলে।"

রাজপুত্র বললেন, "তাহলে উপায়!"

"ঐ জন্যেই তো আমি প্রাণ হাতে করে অন্ধকার সমুদ্র সাঁতরে শত্রুপুরীতে এসেছি।"

রাজপুত্র বললেন, "এই জাহাজে আর কেউ বিষয়টা জানে?"

জয়রত্ন দু-কান মলে রাজপুত্রের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলল, "যদি অপরাধ হয়ে থাকে আমার গলা টিপে এখনই মেরে ফেলুন। কিন্তু লঙ্কার রাজকোষের কথা, আপনার কথা ভেবে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। এই জাহাজের সর্দারণীকে কথাটা বলেছি যাতে নিজের স্বার্থের কথা ভেবে তিনি কালীভূষণকে বাধা দেন। তাতে লঙ্কার স্বার্থ, আপনার স্বার্থ রক্ষা পাবে।"

রাজপুত্র কয়েক মুহূর্ত কী চিন্তা করে বললেন, "তুমি উচিত কাজই করেছ।" তারপর কামরার একটা কোণ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম কর। আমি এখন কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করব।"

৭

জাহাজের সম্মুখদিকে কালীভূষণ তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। মেঘবর্ণ ইতিমধ্যে তাঁর জাহাজটা হয়ে আবার ফিরে এসেছেন। তিনি কালীভূষণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দু-জনে তন্ময় হয়ে শত্রু-জাহাজের হালচাল দেখতে লাগলেন।

কালীভূষণ বলল, "সর্দারণী এক ঘণ্টার সময় নিয়েছিলেন! এখন আবার কী প্যাঁচ কষেন কে জানে!"

মেঘবর্ণ বললেন, "এবার পাল্টা প্যাঁচ দিতে বেগ পেতে হবে। তবে, আমার মনে হচ্ছে সর্দারণী আবার সময় নেবেন..."

মেঘবর্ণের কথা না ফুরোতে মহাআড়ম্বরে চিং-সর্দারের সঙ্গে সর্দারণী জাহাজের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। চোঙায় মুখ দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "আপনাদের প্রস্তাব নিয়ে সর্দারদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। কিছুক্ষণের ভিতরই সভা বসবে। সভা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উত্তর পাবেন।"

কালীভূষণ চোঙায় মুখ রেখে ক্ষুণ্ণস্বরে বলল, "আমরা রাজপুত্রের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন। আমাদের কাছে একটা মুহূর্ত একটি পুরো দিন বলে মনে হচ্ছে। সম্রাটের হয়ে আমি অনুরোধ করছি—অবিলম্বে আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে আমাদের দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিন। সেই সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রকেও।"

মেঘবর্ণ মন্তব্য করলেন, "সাবাস কালীভূষণ! দেখছি গুছিয়ে কথা বলতেও তোমার জুড়ি নেই।"

দাঁতে দাঁত ঘষে সর্দারণী ফিস ফিস করে কালীভূষণের উদ্দেশে বললেন, 'পাষণ্ড! তুমি তোমার মনিব লঙ্কাসম্রাটের বিরুদ্ধে কী চক্রান্ত করেছ, জানতে আমার বাকী নেই! প্রকাশ্যে চোঙায় মুখ দিয়ে কঠোর কণ্ঠে বললেন, "যতক্ষণ না সর্দারদের সভা শেষ হচ্ছে, আমার পক্ষে আপনাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। আপনাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।"

সর্দারণী চিংসর্দারের সঙ্গে অদৃশ্য হলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল চারটে ডিঙি চিং-সর্দারের জাহাজ থেকে রওনা হল, ছুটো উত্তর পশ্চিম কোণে যেখানে চারটে বোম্বেটে জাহাজ নোঙর ফেলেছে সেই দিকে আর ছুটো দক্ষিণে চিং-সর্দারের জাহাজের বাঁ দিকে বাকী চারটে জাহাজের উদ্দেশে।

চিন্তাকুল কণ্ঠে মেঘবর্ণ বললেন, "ডিঙিগুলো সর্দারদের কাছে সর্দারণীর তলব নিয়ে যাচ্ছে। সর্দাররা এসে জুটবার পর সভা বসবে। বুঝতে পারছি না, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে গিয়ে ঠেকবে, না, বিনা লড়াইয়ে শেষ হবে।"

কালীভূষণ বলল, "যত সময় যাবে, আমাদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বার পথ ততই বন্ধ হতে থাকবে। এমন কি, আসল রাজকোষের রহস্যটাও ফাঁস হয়ে যেতে পারে, আর তখন ঐ রাজকোষ সামলানো মুস্কিল হবে। রাজপুত্রকেও ওদের হাত থেকে বার করে আনাও কঠিন হবে।"

মেঘবর্ণ বললেন, "আসল রাজকোষের সিন্দুকটাও ডিঙিতে লুকোনো রয়েছে। শত্রুর চোখে ধূলো দেবার পক্ষে ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। কিন্তু ডিঙি উল্টে গিয়ে রাজকোষের সলিল সমাধি না হয়।"

ক্ষিতিভূষণ কখন তার জাহাজ থেকে এসে আবার এ-জাহাজে হানা দিয়েছে, কালীভূষণ ও মেঘবর্ণ টের পাননি। নিঃসাড়ে সে ছু-জনের মাঝে এসে দাঁড়াল। অস্ফুটস্বরে বলল, "ডিঙিটা জাহাজে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছি। খোয়া যাবার কোনো ভয় নেই।"

মেঘবর্ণ বললেন, “কিন্তু ওরা যদি আমাদের অবিশ্বাস করে হঠাৎ দলে বলে আমাদের আক্রমণ করে বসে, তখন রাজপুত্র, রাজকোষ বাঁচানোর কোন্ রাস্তা আমাদের থাকবে ? সেক্ষেত্রে আমরা কী করব ?”

কালীভূষণ বলল, “আমি কিছুক্ষণ একাই শত্রুদের সামলাবো। ক্ষিতিভূষণ ঝটপট আসল রাজকোষ ডিঙি থেকে তার জাহাজে তুলে নেবে। তারপর আপনি ও ক্ষিতিভূষণ পাল তুলে লঙ্কার দিকে ছুটবেন। আমাদের দলের ন-খানা জাহাজের দূরবীনে যে-মুহূর্তে আপনাদের দুটি জাহাজকে ফিরে যেতে দেখা যাবে, তৎক্ষণাৎ তারা আমাকে সাহায্য করার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসবে।”

মেঘবর্ণ বললেন, “কিন্তু রাজপুত্র ? রাজপুত্রকে কী করে হাত করবে ?”

কালীভূষণ বলল, “প্রথম আমার ফন্দি ছিল এই রকম : রাজপুত্রকে হাত করে নকল রাজকোষ দিয়ে শত্রুকে বুঝ দেবো। আপনি রাজপুত্রকে নিয়ে, ক্ষিতিভূষণ রাজকোষ নিয়ে লঙ্কার দিকে পাড়ি জমাবেন। আমি অপেক্ষা করব। নকল রাজকোষের চালাকিটা ধরা পড়লে, শত্রুরা জাহাজ আক্রমণ করতে এলে আমি বাধা দিতে থাকবো। বাধা দিতে দিতে পিছন হটবো। ইতিমধ্যে দূরবীনে নিশানা পেয়ে আমাদের ন-খানা জাহাজ ছুটে আসবে। তখন সমানে সমানে লড়াই হবে। কিন্তু যদি এরা গোড়াতেই রাজকোষের আসল নকল নিয়ে হাঙ্গামা বাধায়, যদি রাজপুত্রকে হাতছাড়া না করে তাহলে ক্ষিতিভূষণ রাজকোষ নিয়ে খানিকটা পিছু হটবে। সেখান থেকে আমাদের ন-খানা জাহাজকে সঙ্কেত দেবে। আমি ও আপনি সুযোগ বুঝে চিং-সর্দারের জাহাজে চড়াও হয়ে রাজপুত্রকে হাত করার চেষ্টা করব। বাকী জাহাজগুলো আমাদের উপর চড়াও হলে মাঝ-সমুদ্রে যতক্ষণ সম্ভব পিছু হটে আমরা আত্মরক্ষা করব। সঙ্কেত পেয়ে ইতিমধ্যে আমাদের জাহাজগুলো

এসে পড়লে আপনি রাজপুত্রকে নিয়ে ক্ষিতিভূষণের জাহাজের দিকে ছুটবেন। সেখান থেকে রাজকোষ নিয়ে লঙ্কায় পাড়ি দেবেন। ক্ষিতিভূষণ সামনে এগিয়ে এসে আমার পাশে লড়বে।"

মেঘবর্ণ বললেন, "জয়রত্ন সফল হলে হয়তো কোনো হাঙ্গামাই বাধবে না। নকল রাজকোষের বিনিময়েই আমরা রাজপুত্রকে পাবো।"

কালীভূষণ চিন্তাকুল স্বরে বলল, "জানি না, কী হবে। তবে কার্যোদ্ধার না করে লঙ্কায় ফিরবো না। প্রাণের চেয়ে মান বড়।"

ক্ষিতিভূষণ মনে মনে কী একটা ফন্দি আঁটছিল! হঠাৎ কালীভূষণের কাঁধে হাত রেখে সে বলল, "দাদা, চিরকাল তুমি আমাকে সামলেছো। তোমার নামের সঙ্গে আমার নামটাও বড় হয়ে উঠেছে। এবার হয়তো তোমার ঋণ এক আনা শুধতে পারবো। যদি অদৃষ্টে থাকে এবারকার সঙ্কটে ছোট ভাই বড় ভাইকে সামলাবে।"

কালীভূষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ক্ষিতিভূষণের মর্ম ভেদ করবার চেষ্টা করে বলল, "তোমার মতলবটা কী ক্ষিতি? এমনিতেই এবার অবস্থা সঙ্গিন। দেখো, বাহাদুরী করতে গিয়ে বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপিয়ো না।"

ক্ষিতিভূষণ হেসে বলল, "না, দাদা, না। এবার তুমি তোমার ছোট ভাই-এর কেরামতি দেখে নিও।"

মেঘবর্ণ বললেন, "কেরামতির রকমটা একবার খুলেই বলো না।"

মেঘবর্ণ ও কালীভূষণের কৌতূহলে ইন্ধন দিয়ে ক্ষিতিভূষণ হাসতে হাসতে চলে গেল। সতরঞ্চ খেলার পাকা খেলোয়ার যেমন সাতটা চাল আগে কিস্তির নমুনা দেখতে পায়, ক্ষিতিভূষণের মনে হলো সে মাঝ-দরিয়ার মারাত্মক খেলায় তেমনি একটা চালের সন্ধান পেয়েছে।

৮

চিং-সর্দারের সাজানো কামরায় সর্দারদের সভা বসল। মেঝের পুরু গালচে, দেয়ালে রঙীন আলো, কাঠের নক্সা-করা খিলান থেকে ঝোলানো বিরাট একটা পদ্মের মতন জমকালো একটা ঝাড়, ড্রাগনের বিকট মূর্তি, সুন্দর ছাঁচে কুদে বার করা চন্দন কাঠের তেরোটি সিংহাসন।

এ যেন চীনদেশেরই কোন রাজ-দরবার। সবচেয়ে বড় একটা সিংহাসনে বসেছেন চিং-সর্দার। তার দু-পাশের দুই দেয়ালে সারি সারি সর্দাররা বসেছেন। হঠাৎ চিং-সর্দারকে দেখে মনে হতে পারে ছবির বই থেকে একটি চীনসম্রাটকে তুলে নিয়ে ঐ সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সর্দারণী চিং-সর্দারের সিংহাসনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। কী একটা দুশ্চিন্তায় তাঁর চেহারার জলুষ মরে গিয়েছে। তিনি আস্তে আস্তে খুব স্পষ্ট করে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, "আপনারা জানেন লঙ্কার রাজপুত্র ও রাজকোষ—এ-দুয়ের কোনটাতেই আমাদের লোভ নেই। কিন্তু আমাদের সে-ভান না করে উপায় ছিল না। লঙ্কার গায়ে কোপ না দিলে কালীভূষণকে খেলায় নামানো যেত না। আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কালীভূষণ, ক্ষিতিভূষণ দুজনেই পুরোপুরি খেলায় মেতেছে। সারা পৃথিবীতে বুদ্ধি ও কৌশলে যার নাকি তুলনা নেই, সেই অসাধারণ মেঘবর্ণও স্বয়ং এসে লঙ্কার তরফে খেলায় যোগ দিয়েছে।

"আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল এই খেলায় কালীভূষণকে হটিয়ে দিয়ে লঙ্কার অভিমানে আঘাত দেওয়া। লঙ্কার দম্ভ এতটা বেড়েছে যে সে এখন তার বোম্বেটে দল নিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার চারদিকের সমুদ্রে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। অন্যরাজ্যের বোম্বেটেদের সে বিশেষ একটা আমল দিতে চায় না। হতে পারে তাদের সাহস ও কৌশল মানুষের কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফলে আমরাও সবাই তাদের পথ ছেড়ে দিচ্ছি, তারাও অবাধে সমুদ্র শাসন করে বেড়াচ্ছে। এখন একটা ছুতোয়, একটা কারণ বার করে আমরা যদি কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণকে লড়াইয়ে নামিয়ে হটিয়ে দিতে না পারি, তাহলে অন্যান্য রাজ্যের বোম্বেটেদলদের পাত-গুটোতে হবে। এই জন্যই রাজকোষের ছুতোয় আমরা রাজপুত্রকে হরণ করেছি।

"আমাদের আরো একটা উদ্দেশ্য আছে। কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের দৌড়টা বুঝে নেওয়া। সাহস ও কৌশলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়ে বোম্বেটে হিসেবে তাদের যাচাই করে নেওয়া। পৃথিবীর এক নম্বর বোম্বেটে কালীভূষণ না আমাদের সর্দার চিং—"

চিং-সর্দার হেসে বললেন, "না, আমাদের বুদ্ধিদায়িনী অসমসাহসী সর্দারণী --"

বোম্বেটে-সর্দাররা 'সাধু' 'সাধু' বলে একযোগে কোলাহল করে উঠলেন। সর্দারণী মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বললেন, "হ্যাঁ, চিরকালের জন্য বোম্বেটেদের ইতিহাসে কালীভূষণের স্থান নির্ণয় করে দিতে হবে।"

আরব-বোম্বেটে ইসমাইল পাশা বললেন, "এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হার-জিতের মীমাংসা কীভাবে হবে জানা দরকার।"

সর্দারণী বললেন, "কালীভূষণ যদি রাজকোষের বিনিময়ে রাজপুত্রকে ফিরে পায়, আমরা জিতবো; কারণ আমরা যা চেয়েছিলুম তাই পেলুম। কিন্তু যদি নকল রাজকোষ গছিয়ে আমাদের চোখে

ধুলো দিয়ে রাজপুত্রকে সে আমাদের হাত থেকে বার করে নিয়ে চলে যায়—আমরা হারবো, কারণ আমরা যা চেয়েছিলুম তা পেলুম না। যদি আমাদের ভিতর আপোষের বদলে লড়াই হয়, সেই লড়াইয়ে যদি সে আমাদের হার মানিয়ে রাজপুত্রকে ছিনিয়ে নেয়, আমরা হারবো। কিন্তু আমরা লড়াইয়ে হেরে গিয়েও যদি রাজপুত্রকে হাতে রাখতে পারি, তাহলে হারজিতের মীমাংসা হবে না। ধরে নিতে হবে লড়াইয়ে আমরা কেউ কারো উপর টেক্কা দিতে পারলুম না।"

চিং-সর্দার বললেন, "এখন আপনি লঙ্কাসম্রাটের প্রস্তাবটা সর্দারদের বুঝিয়ে বলুন।"

সর্দারণী বললেন, "লঙ্কাসম্রাটের তরফে কালীভূষণ বলছেন রাজপুত্রকে তার হাতে সমর্পণ করলে পর তিনি আমাদের জাহাজে স্বয়ং রাজকোষ পৌঁছে দেবেন।"

তামিল-বোম্বেটে পদ্মনাভন বললেন, "তাহলে তো কালীভূষণ হার স্বীকার করেই বসেছেন। রাজকোষ দেওয়ার অর্থ আমাদের দাবি মেনে নেওয়া।"

সর্দারণী বললেন, 'কিন্তু পরে যদি দেখা যায় যে সে-রাজকোষ আসল নয়, নকল ?"

মিশরের সুলতান খাঁ বললেন, "তাহলে রাজকোষ আগেই যাচাই হওয়া দরকার।"

সর্দারণী বললেন, "মুস্কিল হচ্ছে আসল-নকলের তফাতটা কে ধরবে ? শুনেছি কালীভূষণ একটার জায়গায় দুটো রাজকোষ এনেছে। দুটোর একটা নকল। নকলটা চেনা কঠিন হবে। মাঝ-দরিয়ায় জহুরী এনে আসল নকলের চুলচেরা বিচার করাও সম্ভব নয়।"

সর্দাররা সমস্বরে বলে .উঠল, "তাহলে, এখন আমাদের কর্তব্য কী ?"

সর্দারণী বললেন, "কর্তব্য কালীভূষণের নৌবহরের তিনটে জাহাজ তালাস করে দেখা। যদি একটার জায়গায় দুটো রাজকোষ থাকে, দুটো রাজকোষই হাতকরা, কারণ তাহলে আসল-নকলের সমস্যা নিয়ে আপাতত আমাদের মাথা ঘামানো দরকার হয় না। আসলের বদলে নকল রাজকোষ নিয়ে ঠকবার সম্ভাবনাও থাকে না।"

সর্দাররা সর্দারণীর এই বুদ্ধি সমস্বরে সাধুবাদ দিয়ে মেনে নিলেন।

বন্দী রাজপুত্র তাঁর কামরায় বসে আকাশ পাতাল চিন্তা করছিলেন। জয়রত্ন একটি রক্ষীর সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিল। এই সময়ে সর্দারণী এসে কামরায় ঢুকলেন। রাজপুত্রের আরাম কেদারার পাশে একটা আসনে বসলেন। বললেন, "বোম্বেটে জাহাজে বন্দী হয়ে রয়েছো, এ অবস্থায় তোমাকে খুব একটা হাসিখুশি দেখবো এ-রকম আশা করা অন্যায়। কিন্তু তোমাকে যেন বিশেষ চিন্তিত দেখছি।"

রাজপুত্র বললেন, হ্যাঁ, আমি একটা দুশ্চিন্তায় পড়েছি।"

"আপত্তি না থাকে তো খুলে বলো। যদি তোমার দুশ্চিন্তার কিছুটা লাঘব করতে পারি—।"

"আমি কালীভূষণের সম্বন্ধে একটা দুঃসংবাদ পেয়েছি।

"খবরটা আমারও কাছে এসেছে!"

"জানি, জয়রত্ন তোমায় বলেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। কালীভূষণের অর্থলোভ থাকলে সে তো সাত রাজার ঐশ্বর্য লুট করে আনতে পারে।"

"মনে হয় রাজকোষের লোভ কালীভূষণের একটা লোক-দেখানো ছল মাত্র। কোনো একটা কূট অভিসন্ধি ওর আছে।

অবশ্য আমাদেরও বুদ্ধি আর তলোয়ার নেহাৎ ভোঁতা নয়। তবু কালীভূষণের ইমান ধুলোয় গড়াতে দেখলে আমাদের মাথা হেঁট হবে। সে না টিকলে বোম্বেটেরাও টিকবে না। বোম্বেটে নামটাই ইতিহাস থেকে মুছে যাবে।"

রাজপুত্র বললেন, "তোমার কথা শুনে মনে হয়, পারবে তুমি কালীভূষণের হয়ে লড়তে। সন্দেহ হয়, তোমার সঙ্গে কালীভূষণের একটা যোগাযোগ আছে।"

সর্দারণী রাজপুত্রের কথায় শিউরে উঠলেন। পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ও কথা আজ থাক। সময় হয়ে এলো।"

রাজপুত্র সর্দারণীর কথায় বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। তাঁর মন জুড়ে আবার প্রশ্ন জাগল, "এই সর্দারণী কে ?"

৯

মাঝরাতের কাছাকাছি চিং-সর্দারের জাহাজ থেকে সংবাদ এল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চিং-সর্দার ও সর্দারণী আটটি বোম্বেটে সর্দার সঙ্গে নিয়ে রাজকোষ যাচাই করতে আসবেন। সর্দারণী অনুরোধ জানালেন—চিং-সর্দার সাধারণ বোম্বেটে নন। চীনরাজ্যে সম্রাটের তুল্য তাঁর সম্মান। তাঁকে যেন যথারীতি মানী অতিথির সম্মান দেওয়া হয়।

কালীভূষণ জানাল—মানী-অতিথির অভ্যর্থনায় কোনও ত্রুটি ঘটবে না। বোম্বেটে কালীভূষণ মানীর মান রাখতে জানে।

কালীভূষণ যখন তার নৌবহরে হুকুম দিয়ে একটা ঘূর্ণিহাওয়ার মতন ফিরছিল, সেই ফাঁকে ক্ষিতিভূষণ মেঘবর্ণকে আড়ালে নিয়ে বলল, "কবি, চিং-সর্দারের দলবল যখন নকল রাজকোষ যাচাই করতে থাকবে, আমি এক ছুতোয় চিং-সর্দারকে আমার জাহাজে নিয়ে যাবো।"

মেঘবর্ণ বললেন, "চিং-সর্দার ছুতোয় ভুলে তোমার জাহাজে যেতে রাজী হবেন বলে বিশ্বাস হয় না।"

ক্ষিতিভূষণ বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল, "রাজী হবেন!"

মেঘবর্ণ ক্ষিতিভূষণের কথার ভঙ্গী ও মুখভাব লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হলেন। বললেন, "তোমার মতলব কী বলো তো?"

"ক্ষমা করো, বলতে পারব না।"

"তাহলে তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার সীমা থাকবে না।"

“বিশ্বাস করো কবি, আমার ফন্দিটা এবার না টিকে যায় না!”

“ফন্দি ফলাতে গিয়ে যদি বিপদে পড়ো।”

“বিপদে পড়বো না।”

“যদি আমাদের বিপদে ফ্যালো।”

ক্ষিতিভূষণ প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলল, “ফেলবো না।”

মেঘবর্ণ নীরবে ক্ষিতিভূষণের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

“কবি, তাহলে তোমার সম্মতি পেলুম!”

মেঘবর্ণ বললেন, “তা না হয় পেলে। কিন্তু বলো তো আজ হঠাৎ তোমার এই মনের জোর কোত্থেকে এলো। তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি এক নূতন ক্ষিতিভূষণ।”

ক্ষিতিভূষণ ঈষৎ হেসে বলল, “যেখানে তলোয়ারেব কোপ অচল সেখানে বুদ্ধির খেলায় বেকুব বনে নিজেকে এতটা কাল ধিক্কার দিয়েছি। কখনো দাদার কীর্তির পাশে নিজের জোরে স্থান করে নিতে পারবো ভাবিনি। আজ হঠাৎ আমি সঙ্কটের মুহূর্তে চক্ষের পলকে যেন জেগে উঠেছি। আজ মাঝ-সমুদ্রে যে জীবন-মরণ খেলার আয়োজন হচ্ছে, আমার পরীক্ষার সেটা একটা মহাসুযোগ বলে আমি গ্রহণ করেছি।”

১০

চিং-সর্দারের জাহাজ থেকে কখন সংবাদ আসে, মেঘবর্ণ ও কালীভূষণ তারই উৎকণ্ঠ অপেক্ষায় রয়েছেন। হঠাৎ মেঘবর্ণ বললেন, "এ লড়াই রাজকোষের, না রাজসিংহাসনের আমি ভেবে এখনো থই পাচ্ছি না, কালীভূষণ।"

কালীভূষণ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "ধারণাটা দেখছি কিছুতেই আপনি মন থেকে দূর করতে পারছেন না।"

মেঘবর্ণ বললেন, "যা সত্য তা মন থেকে কখনোই দূর হবার নয়।"

কালীভূষণ বলল, "কিন্তু রাজপুত্রকে জামিন রেখে রাজসিংহাসনের লড়াই, এ-ধারণাটাও কি সত্য?"

মেঘবর্ণ ঈষৎ হেসে বললেন,"সত্য বলেই হয়তো এ-ধারণাটাও মন থেকে সরছে না। হুঁশিয়ার কালীভূষণ। রাজকোষ ছাড়তে হলেও রাজপুত্রকে হাতছাড়া করা চলবে না। ধরে নেওয়া ভালো যে এ-লড়াই সিংহাসনের লড়াই।"

মেঘবর্ণ নীরব হলেন। কালীভূষণের ললাট একটা গভীর দুশ্চিন্তায় কুঞ্চিত হল।

চিং-সর্দারের জাহাজ থেকে হাঁক দিয়ে জানান দেওয়া হল, তিনি সর্দারণী ও সর্দারদের নিয়ে আপোষের প্রথম পর্ব চুকোতে আসছেন। তাঁরা সর্বপ্রথম রাজকোষ যাচাই করবেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ডিঙিতে দু-জন সর্দার কালীভূষণের জাহাজের দিকে

রওনা হলেন। আর চারটে ডিঙি চিং-সর্দারের জাহাজের সামনে বাকী দলটার অপেক্ষায় রইল।

কালীভূষণের মুখে একটা বেপরোয়া ভাব ফুটল। তার দলের বোম্বেটেরা তখন সাঁজোয়া পরে জাহাজের সর্বত্র টহল দিচ্ছে। মেঘবর্ণকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কালীভূষণ শেষবারের মতন মন্ত্রণায় বসল।

কালীভূষণের বোম্বেটেরা হাঁক দিয়ে উঠল। একজন শিঙা ফুঁকে দিল। একটা ডিঙি জাহাজের পাশে ভিড়ল। পাটাতন থেকে একটা সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হল। সিঁড়ি বেয়ে চিং-সর্দারের দলের দুই সর্দার কালীভূষণের জাহাজের উপর উঠে এলেন। কালীভূষণ ও মেঘবর্ণ এগিয়ে গেলেন। অভ্যর্থনার পালা চুকবার পর শিঙা ফুঁকে জানান দেওয়া হল তাঁরা নিরাপদ। সঙ্গে সঙ্গে চিং-সর্দারের বাকী দলটা নিয়ে চারটি ডিঙি রওনা হল। চিং-সর্দার ও সর্দারণী সবশেষে এলেন। তাঁরা আসবার পর জাহাজের পাটাতনে আপোষ-সভার বৈঠক শুরু হল।

মস্ত লাল একটা গালচে পাটাতনে পেতে দেওয়া হয়েছিল। তার দু-পাশে লঙ্কা থেকে আনা লাল কাঠের কারিকুরি-করা কেদারায় চিং-সর্দার তাঁর দলবল নিয়ে বসলেন।

আদর আপ্যায়নের একটা চূড়ান্ত রকমের মহলার পর চিং-সর্দার বললেন, "এখন কাজের কথায় আসা যাক। রাজকোষ কোথায় ?"

কালীভূষণ বলল, "রাজকোষ আমার জিম্মায় এই জাহাজেই আমার কামরায় আছে। আমার কামরায় যেতে যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, তাহলে রাজকোষ এখানে টেনে আনতে হয় না। যদি এখানে বসে দেখতে চান, সে-ব্যবস্থাও করতে পারি।"

সর্দারণী বললেন, "আপনার কামরায় উৎপাত না করে আমরা এখানেই কাজটা সারতে চাই।"

কালীভূষণের মুখের ভাব দেখে মনে হল সে যেন বিশেষ অসুবিধায় পড়ল। একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'আচ্ছা তাই হবে।" কালীভূষণের ইঙ্গিতে একদল বোম্বেটে কালীভূষণের কামরার দিকে চলে গেল। খানিক বাদে তারা গলদঘর্ম হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা বিশাল সিন্দুক বয়ে নিয়ে এল। কালীভূষণ তার কোমরবন্ধের একটা খাপ থেকে মস্ত একটা চাবি বার করল। তারপর সিন্দুকের দিকে তাকিয়ে সে যেন একটা সমস্যায় পড়ল। একটা পাথরের মূর্তির মতন সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

চিং-সর্দার বললেন, "লঙ্কাসম্রাটের রাজকোষ বোম্বেটেদের হাতে তুলে দিতে প্রভুভক্ত কালীভূষণের বীরের ধর্মে বাধছে। তার পক্ষে এই দ্বিধা স্বাভাবিক।"

কালীভূষণ যেন চিং-সর্দারের এই কথায় চেতনা ফিরে পেল। তার ভাবলেশহীন মুখের পানে তাকিয়ে তার মনের রহস্য কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব ছিল না। চাবি দিয়ে তালাটা খুলে নিয়ে কালীভূষণ বিপন্নের মতন এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

চিং-সর্দার বললেন, "বৃথা সময় নষ্ট করবেন না, ডালাটা খুলুন। আমরা লঙ্কাসম্রাটের অর্ধেক রাজকোষ স্বচক্ষে দেখে ধন্য হই।"

একটা প্রচণ্ড টানে কালীভূষণ ডালাটা খুলে ফেলল। সকলের মুখ থেকে সমস্বরে একটা বিস্ময়ের ধ্বনি বার হল। রাজকোষের দিকে সকলে নিষ্পলক চক্ষে চেয়ে রইলেন। জাহাজের পাটাতনে রাজকোষ একখণ্ড তারাভরা আকাশের মতন ঝলমল করে উঠল।

সর্দারণী এতক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে কালীভূষণকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি শান্তকণ্ঠে সর্দারদের বললেন, "আপনারা এবার রাজকোষ যাচাই করুন।"

সর্দাররা একলাফে উঠে এসে রাজকোষ ঘিরে দাঁড়ালেন।

তাঁদের নানা মন্তব্য ও বিস্ময় ধ্বনিতে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হল। কিন্তু সর্দারণী যেখানে ছিলেন, সেখানেই রইলেন। রাজকোষের উত্তেজনা যেন তাঁকে স্পর্শ করল না।

কালীভূষণ ও সর্দারণী পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করছিলেন। প্রায় একই সময়ে কী একটা কথা যেন দু-জন দু-জনকে বলতে গেলেন। কিন্তু দু-জনই অবশেষে নিজেকে সামলে নিলেন।

চিং-সর্দারও রাজকোষ যাচাই ব্যাপারটায় যোগ দেননি। খানিকটা তফাতে তিনি একা বসে ছিলেন। আড়াল থেকে ক্ষিতিভূষণ সেখানে এল। মেঘবর্ণ দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছেন, ক্ষিতিভূষণ আড়চোখে দেখল। এক মুহূর্ত যেন ক্ষিতিভূষণ ইতস্তত করল। তারপর সে কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে চিং-সর্দারের সম্মুখে এসে তাঁকে কুর্নিশ করল। সঙ্গে সঙ্গে কী একটা জিনিষ বার করে তাঁকে দেখালো।

চিং-সর্দার চমকে উঠলেন। বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বার হল না। ক্ষিতিভূষণ বলল, "সম্রাট জাহাজে সুগোপনে এসেছেন। কারো জানবার কথা নয়। কালীভূষণেরও নয়। নকল রাজকোষের জলুষে ভুলবেন না। তাঁর কথা রক্ষা করার জন্য আসল রাজকোষ নিয়ে স্বয়ং সম্রাট অপেক্ষা করছেন। আর দ্বিধা না করে আসুন। বিলম্বে অনর্থ ঘটতে পারে।"

চিং-সর্দার ক্ষিতিভূষণের হাতে লঙ্কাসম্রাটের আপন পাঞ্জা দেখলেন। এ-পাঞ্জা সম্রাটের নিজের কাছে থাকে। এ-পাঞ্জার আহ্বান কী করে অস্বীকার করেন! সব সন্দেহ, সব সংশয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। তবু একবার বললেন, "কিন্তু সর্দারণী? সর্দারণীকে কি এ-বিষয়ে জানানো উচিত নয়?"

ক্ষিতিভূষণ কোনও জবাব দিল না, শুধু প্রচণ্ড বেগে মাথা নাড়ল।

ক্ষিতিভূষণের সঙ্গে দ্রুতপদে চিং-সর্দার প্রায় ছুটে চললেন। ছুটতে ছুটতে একটা কামরার ধারে পাটাতনের এক প্রান্তে তাঁরা এলেন।

সেখানটা অন্ধকার। পাশেই ক্ষিতিভূষণের জাহাজ। পাটাতনের ধার থেকে ঝোলানো একটা দড়ির মই বেয়ে ক্ষিতিভূষণ নামবার আয়োজন করতে চিং-সর্দার ফিসফাস করে জিজ্ঞাসা করলেন, "সম্রাট কোথায় ?"

ক্ষিতিভূষণ হাত দিয়ে নিজের জাহাজটা দেখিয়ে দিল এবং বলল, "সম্রাট ঐ জাহাজে অপেক্ষা করছেন। কালীভূষণ বিশ্বাসঘাতক টের পাবার পর কোন্ ভরসায় লঙ্কাসম্রাট আর তার জাহাজে আসেন।"

কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হলেও এক মুহূর্তের জন্য চিং-সর্দার বিচলিত হলেন। কিন্তু অজগরের চোখ যেভাবে পাখিকে টানে, লঙ্কাসম্রাটের আপন-পাঞ্জা তাঁকে সে-রকম দুর্নিবার টানে টানল। দুঃসাহসে বুক বেঁধে তিনি ক্ষিতিভূষণের পিছু পিছু দড়ির মই বেয়ে নামতে লাগলেন।

নীচে জাহাজের সঙ্গে একটা ডিঙি বাঁধা ছিল। সেই ডিঙিতে উঠবার পর ক্ষিতিভূষণ দড়ির বাঁধন কেটে ডিঙি ছেড়ে দিল। ডিঙিটা কালীভূষণের জাহাজের গা ঘেষে অন্ধকারে নিঃশব্দে এগোল। ক্ষিতিভূষণের জাহাজ পাশে পড়ে রইল।

চিং-সর্দার ব্যাপারটা বুঝে উঠে ভয়ে বিস্ময়ে বললেন, "ওদিকে চলেছো কোথায়?"

ক্ষিতিভূষণ হেসে বলল, "জাহান্নামে।"

ভয়ে রোষে উন্মত্ত হয়ে চিং-সর্দার কোষ থেকে তলোয়ার বার করতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। চকিতে ডান হাতের বজ্রমুঠিতে তাঁর হাতটা চেপে ধরে বাঁ-হাতে বুকের কাছে পোষাকের ভাঁজ থেকে একটা রোমাল বার করে ক্ষিতিভূষণ চিং-সর্দারের নাকে চেপে ধরল।

একটা উগ্র গন্ধে অভিভূত হয়ে পাঁচ-ছ মুহূর্ত ছটফট করে চিং-সর্দার বেহুঁশ হয়ে ডিঙির পাটাতনে লুটিয়ে পড়লেন। টেনে-টুনে পাটাতনের উপর তাঁকে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে আবার কুর্নিশ করে হেসে ক্ষিতিভূষণ বলল, "আপনি আপাতত পাঁচ-ছ ঘণ্টা সুখনিদ্রায় থাকুন। ওদিককার হাঙ্গামা চুকে গেলে পরে আপনার বিষয় আবার চিন্তা করব।"

এই ডিঙিরই পাটাতনের তলায় লুকোনো ছিল লঙ্কার আসল রাজকোষ। ক্ষিতিভূষণ নিঃসাড়ে চিং-সর্দার ও রাজকোষ নিয়ে অন্ধকারে পাড়ি দিল।

একজোড়া চোখ অন্ধকারে ক্ষিতিভূষণের জাহাজে পাটাতনের প্রান্তে পাহারায় ছিল। ডিঙি খুলেই ক্ষিতিভূষণ তাকে হাত তুলে সঙ্কেত করল।

ক্ষিতিভূষণের জাহাজের মাস্তুলের গোড়ায় আবার কয়েকটি

বোম্বেটে সঙ্কেতের অপেক্ষায় ছিল। পাটাতনের কিনারা থেকে লোকটি ক্ষিতিভূষণের সংকেত পেয়ে তাদের হাত তুলে নিশানা দিতেই তারা মাস্তুলের গোড়ায় আগুন ধরিয়ে দিল। তুফান হাওয়ায় অল্পক্ষণের ভিতব দাউ দাউ করে সেই আগুন জ্বলে উঠে ছড়িয়ে পড়ল।

ক্ষিতিভূষণের জাহাজের মাল্লারা চেঁচিয়ে উঠল, "আগুন, আগুন!" তারা সকলেই আগে থেকে জানতো এই অগ্নিকাণ্ডের অর্থ কী। তাই আগুন নেভানোর চেয়ে হৈ চৈ করে পাটাতনের একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি করে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে তোলাতেই তাদের বেশী আগ্রহ দেখা গেল। জাহাজ বাঁচাতে আগুনে যেটুকু জল তারা ঢালল, তার চেয়ে দশগুণ বেশী জল ঢালল পাটাতনে ও নিজেদের গায়ে।

১১

কালীভূষণের জাহাজে তখন সর্দাররা রাজকোষ যাচাই করতে ব্যস্ত। তাদের মন তখন তন্ময় হয়ে যে যার বখরার স্বপ্ন দেখছে। এই সময় তাদের সুখস্বপ্ন চূর্ণ করে ক্ষিতিভূষণের জাহাজে তুমুল চীৎকার উঠল—আগুন, আগুন।

আগুনের লেলিহান জিহ্বা তখন তুফান হাওয়ার গায়ে ছোবল দিয়ে গর্জন করছে। সর্দাররা ছুটে ক্ষিতিভূষণের জাহাজের দিকে গেলেন। সর্দারণী উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "চিং সর্দার, চিং-সর্দার কোথায় ?"

মেঘবর্ণ অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "একটু আগে তাঁকে পাটাতনের ঐ দিকে যেতে দেখেছি।"

সর্দারণী ছুটলেন। মেঘবর্ণ তাঁকে অনুসরণ করে চললেন। ক্ষিতিভূষণের জাহাজের দিকটায় এসে সর্দারণী থামলেন। এদিক ওদিক লক্ষ্য করে বললেন, "কোথায় ? সর্দার তো এদিকে আসেননি।"

মেঘবর্ণ বিস্ময়ের ভান করে বললেন, "অথচ কিছুক্ষণ আগে স্বচক্ষে দেখলুম হঠাৎ উঠে তিনি এদিকেই এলেন। হয়তো—"

সর্দারণী অস্থির কণ্ঠে বললেন, "হয়তো, হয়তো কী ?"

মেঘবর্ণ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "যদি ক্ষিতিভূষণের জাহাজে গিয়ে থাকেন—"

সর্দারণী প্রখর দৃষ্টিতে মেঘবর্ণকে প্রায় দগ্ধ করে বললেন, "চিং-সর্দার কখনই আমাকে না জানিয়ে ক্ষিতিভূষণের জাহাজে যাননি। সত্যি কথা বলুন।"

মেঘবর্ণ বললেন, "এটা অবশ্য আমার অনুমান। এর চেয়ে বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ চিং-সর্দার সত্যিই কী করে হাওয়া হলেন তা আমার পক্ষে না জেনে বলা উচিত হবে না।"

সর্দারণী তাঁর কোমরবন্ধে তলোয়ারের বাঁটে হাত দিলেন। মেঘবর্ণ হেসে তার অনুকরণ করলেন। সর্দারণীর সঙ্গে তাঁর একটা ভয়ঙ্কর রকমের দৃষ্টি বিনিময় হল। এদিকে সর্দাররা তখন আগুনের কাছাকাছি কালীভূষণের জাহাজে থাকবেন কিম্বা রাজকোষ নিয়ে তখনই প্রস্থান করবেন এই বিষয় নিয়ে একটা তুমুল তর্ক বাধিয়ে দিলেন।

সর্দারণী কঠোর কণ্ঠে তিরস্কার করে বললেন, "আপনারা রাজকোষের চিন্তা থামান। চিং-সর্দার নিখোঁজ। এখন এই বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান। এর চেয়ে বড় বিপদ আমি কল্পনা করতে পারি না।"

সর্দারদের সম্মুখে যেন একটা মারাত্মক বোমা ফেটে পড়ল। তাঁরা বিহ্বল দৃষ্টিতে সর্দারণীর পানে তাকিয়ে রইলেন। এতক্ষণ বাদে তাঁদের হুঁশ হল চিং-সর্দার তাঁদের ভিতর নেই।

সর্দারণী বললেন, "মেঘবর্ণ বলেছেন, হঠাৎ তাঁকে উঠে এদিকে আসতে দেখেছেন কিন্তু তাঁকে এদিকের কোনো দিকেই তো দেখছি না। জানিনা মেঘবর্ণ স্বচক্ষে দেখেছেন, না, সবটাই অনুমান করছেন।"

মেঘবর্ণ বললেন, "চিং-সর্দার এদিকে এসেছিলেন আমি হলফ করে বলতে পারি। তবে তারপর উনি সমুদ্রে হাওয়া খেতে গেলেন, না, মন্ত্রবলে অন্তর্ধান হলেন জানিনা। সুতরাং সে-বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে পারবো না।"

মেঘবর্ণ সকলের অলক্ষ্যে একটা ইশারা করেছিলেন। কালীভূষণ ইঙ্গিত বুঝে চাল চাললেন! বললেন, "মেঘবর্ণ! চিং-সর্দার সম্বন্ধে আপনার এই উদাসীনতায় আমি বিস্মিত। চিং-সর্দার আমাদের মাননীয় অতিথি। আপনি মহানুভব, এ-আচরণ আপনাকে শোভা পায় না।"

সর্দারণীর পানে তাকিয়ে কালীভূষণ বললেন, "জাহাজটা একবার তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা দরকার। জলজ্যান্ত একটা মানুষ তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। চিং-সর্দার এই জাহাজ থেকে নিখোঁজ হলে আমার অখ্যাতির সীমা থাকবে না।"

কালীভূষণের সঙ্গে সর্দাররা জাহাজ তচনচ করে বেড়ালেন। তারপর তার সঙ্গে পাটাতনের নীচেয় জাহাজের বাকী কামরাগুলি খুঁজে পেতে দেখতে গেলেন।

ওদিকে ক্ষিতিভূষণের জাহাজে অগ্নিকাণ্ড প্রায় প্রলয়কাণ্ডে ঠেকেছে। জাহাজের উপরে ও চারিদিকে আকাশটা লাল হয়ে গিয়েছে। দূরে সব কটা জাহাজের সম্মুখদিকে পাটাতনের উপর বোম্বেটেরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

মেঘবর্ণ ও সর্দারণী স্থান কাল ভুলে তুলিতে আঁকা দুটি মানুষের মতন নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন। সর্দারণীর মুখ অকস্মাৎ একটা নিদারুণ বিদ্রূপে বাঁকা হয়ে গেল। বললেন, "দু-হাজার বছর আগে লঙ্কার সিংহাসনে মেঘবর্ণ নামে এক রাজা বসেছিলেন। ভারতবর্ষের মতন একটা বিরাট সাম্রাজ্যের সম্রাট মহামতি অশোক তাঁর সভায় দূত পাঠিয়েছিলেন। সেই মেঘবর্ণের বংশেরই একটি রত্ন দু-হাজার বছর পরে আজ লঙ্কার রাজসভায় শোভা পাচ্ছেন। তবে রাজা হিসেবে নয়, রাজবিদূষক চাটুকার কবি হিসেবে।"

মেঘবর্ণ হেসে বললেন, "দু-হাজার বছর আগের সেই মেঘবর্ণের আর একটি কুলরত্ন, যার নাম দিব্যবর্ণ, ভুয়ো দাবির জোরে লঙ্কার সিংহাসনে বসতে চেয়েছিলেন। সেখানে থাবা দিতে গিয়ে বেজায়

চোট পেয়েছিলেন। তখন বোম্বেটে দল পাকিয়ে নকল রাজাগিরি করে সখ মেটাতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেও তাঁর চেয়ে বড় এক বোম্বেটের ধাক্কায় লঙ্কা থেকে ছিটকে পড়লেন। তখন তিনি গৌরবের আরো এক ধাপ উপরে উঠে ছেলেধরা সাজলেন। নকল বোম্বেটে দল নিয়ে হানা দিয়ে নিজের ভাইপোকে চুরি করে নিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য রাজকোষ, না, রাজসিংহাসন ?"

সর্দারণীর চক্ষু দুটি জ্বলে উঠল। বললেন, "অদৃষ্টের চক্রান্তে দিব্যবর্ণ সিংহাসন হারিয়েছে, কিন্তু সিংহাসনধরে নাড়া দেবার ক্ষমতা হারায়নি। নীতিবোধে বাধে বলে পেশাদার বোম্বেটেদের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাদের উপর দখল ছাড়েনি। আজ লঙ্কা রাজকোষ পাঠিয়ে দিব্যবর্ণের ভয়ে বোম্বেটেদের সঙ্গে রফা করতে চাইছে। আজ রাতেই লঙ্কারাজ্যের সেরা বোম্বেটেকে হয়তো তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে।"

মেঘবর্ণ হেসে দিলেন। পাখির কলকণ্ঠের গানের মতন তাঁর সেই হাসি অগ্নিকাণ্ডের কোলাহলের মধ্যে বাজের বুকে বাঁশির মতন বাজল।

এইসময়ে কালীভূষণ সর্দারদের নিয়ে দুড়দাড় করে একটা ঝড়ের মতন সেখানে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে কালীভূষণ সর্দারণীকে বলল, "আশ্চর্য কাণ্ড! সারা জাহাজ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলুম। চিং-সর্দারের কোনো পাত্তাই পেলুম না।" সর্দারণীর মর্মভেদী দুটি চক্ষের দৃষ্টির সম্মুখে কালীভূষণ বিব্রত বোধ করল। কিন্তু ইস্পাত দিয়ে তৈরী তার স্নায়ু। নিজেকে সামলে নিয়ে এবার সে সর্দারদের লক্ষ্য করে বলল, "ক্ষিতিভূষণের জাহাজটাও খুঁজে দেখা দরকার। আমি এত সহজে হাল ছাড়তে প্রস্তুত নই। চিং-সর্দারকে খুঁজে বার করতেই হবে। তাছাড়া, আসল রাজকোষ ওখানেই।"

সর্দারণী তিক্তকণ্ঠে বললেন, "ঐ অগ্নিকাণ্ডের ভিতর ওখানে এখন কে মরতে যাবে ?"

মেঘবর্ণ বললেন, "আমি যাবো। যদিও চিং-সর্দার আমার কেউ নন, তবু তিনি আমাদের অতিথি। তাঁকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে যদি প্রাণ দিতে হয়, দেবো"

সর্দারণী মেঘবর্ণের এই কূট চালে অপ্রস্তুত হলেন। সর্দাররা তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। সর্দারণী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "চিং-সর্দার ঐ জাহাজে গিয়েছেন বিশ্বাস হয় না। তবু, মনে সংশয় রাখতে নেই। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে। যদি প্রাণ দেবার প্রশ্ন ওঠে, সকলের আগে দাবি আমার।"

জাহাজের কিনারে কিনারে মোটা রশি ঝুলছিল। শক্ত করে পাটাতনের গায়ে লোহার কড়ায় বাঁধা। একটা রশি ধরে সর্দারণী ঝুলে পড়লেন। একটা ভীষণ দোলা দিয়ে একলাফে ক্ষিতিভূষণের জাহাজে পাটাতনের উপর পড়লেন। দেখাদেখি সর্দাররা এক এক করে রশি ধরে দুলতে দুলতে ঝুপ ঝুপ করে ক্ষিতিভূষণের জাহাজে লাফ দিয়ে পড়লেন।

কালীভূষণ একটা রশি ধরে লাফ দিতে যাবেন, মেঘবর্ণ তলোয়ার দিয়ে রশিটা কেটে ফেললেন। মেঘবর্ণ ফিসফাস করে বললেন, "আর অভিনয়ের প্রয়োজন নেই! আলোর সঙ্কেত পেয়েছি। চিং-সর্দার তাঁর জাহাজে নিরাপদে পৌঁছেছেন। এখনই তিনি তাঁর সর্দারদের উদ্দেশে সংবাদ পাঠাবেন।"

মেঘবর্ণের কথা শেষ হতে না হতে চিং-সর্দারের জাহাজের সম্মুখ দিকে সবকটা আলো জ্বলে উঠল। তুরী ভেরি বাজল। ভারিক্কি চালে চিং-সর্দার তাঁর ঝলমলে পোশাকে সম্মুখে এসে নাটকীয় ভঙ্গিতে চৈনিক কুর্নিশ করলেন। তারপর গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করলেন "রাজকোষ উদ্ধার করে আমি জাহাজে ফিরেছি। রাজপুত্র ও রাজকোষ, দুই-ই এখন আমাদের হাতে। আর একটা সুসংবাদ

দিচ্ছি। বোম্বেটে-ধুরন্ধর ক্ষিতিভূষণ আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি এখন আমাদের হাতে বন্দী।"

ক্ষিতিভূষণের জাহাজে সর্দাররা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন। কিন্তু সর্দারণী স্তব্ধ নিশ্চল একটা মূর্তির মতন একধারে একা দাঁড়িয়ে রইলেন। সংশয় সন্দেহ ও কৌতূহল ছাপিয়ে একটা গভীর নৈরাশ্য তাঁকে ঘিরে ধরল। তাঁর কানে চিং-সর্দারের ঘোষণা একটা নিষ্ঠুর পরিহাসের মতন শোনাল।

কালীভূষণের বুকটা হঠাৎ দ্রুততালে বেজে উঠল। তলোয়ারের বাঁটে তার মুঠ শিথিল হয়ে এল। কিন্তু মেঘবর্ণের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মেঘবর্ণ যখন ঈষৎ হাসলেন, কালীভূষণের চোখের সম্মুখ থেকে হঠাৎ যেন রহস্যের যবনিকা উঠে গেল। কালীভূষণ এগিয়ে এসে মেঘবর্ণের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, "মেঘবর্ণ! ক্ষিতিভূষণের জয় হোক। রাজপুত্র এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। রাজকোষ নিরাপদ।"

কালীভূষণের কথার জবাব দিতে গিয়ে মেঘবর্ণ থেমে গেলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, "জাহাজ সরাও, কালীভূষণ। বোম্বেটেরা এবার বোম্বেটী খেলার মজাটা বুঝুক।"

চিং-সর্দারের ঘোষণার পর সর্দাররা ক্ষিতিভূষণের জাহজ ছাড়বার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সর্দাররা জাহাজে পৌঁছাবার আগেই ক্ষিতিভূষণের বোম্বেটে মাল্লারা অগ্নিকাণ্ডের গোলমালের সুযোগ নিয়ে রশারশি, ডিঙি ইত্যাদি নিয়ে সরেপড়েছিল। সর্দাররা যখন চিং-সর্দারকে খুঁজতে ব্যস্ত তখন তারা ডিঙিতে করে আগের ব্যবস্থামতন চিং-সর্দারের জাহাজের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল।

বিপাকে পড়ে সর্দাররা জাহাজের কিনারায় এসে কলীভূষণের উদ্দেশে চেঁচামেচি সুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঘবর্ণের পরামর্শে

কালীভূষণ তার মাল্লাদের জাহাজ সরিয়ে আনার হুকুম দিল। কালীভূষণের জাহাজ ও ক্ষিতিভূষণের জাহাজের ভিতরের ফাঁকটা বড় হতে লাগল। সর্দাররা হাত তুলে ঘুষি পাকিয়ে চেঁচিয়ে আকাশ তোলপাড় করে তুললেন। তাঁদের নিজেদের জাহাজের মাল্লারা ভাবল চিং-সর্দারের ঘোষণায় উৎফুল্ল হয়ে তাঁরা উল্লাস করছেন। তাছাড়া, চিং-সর্দারের জাহাজ থেকে কোনও হুকুম না আসায় কোনো জাহাজ সম্মুখে এগোতে ভরসা পাচ্ছিল না। কালীভূষণের জাহাজ ক্ষিতিভূষণের জাহাজ থেকে তফাতে চলে আসায় তারা মনে করল, সর্দাররা কালীভূষণের জাহাজে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁদের নিয়েই কালীভূষণের জাহাজ নিশ্চয়ই আগুনের আওতা থেকে দূরে চলে আসছে। ক্ষিতিভূষণের জাহাজের পাটাতনে সর্দাররা প্রাণভয়ে
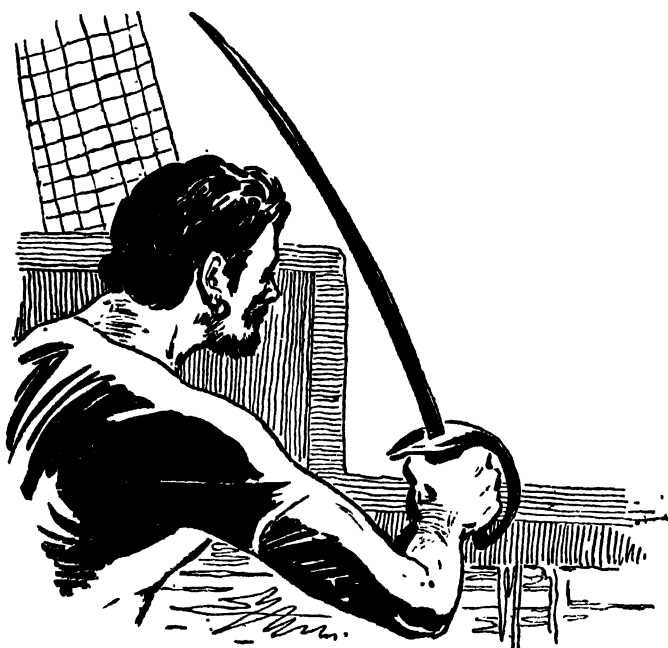
কালীভূষণ একটু পিছু হটে গিয়ে খাপ থেকে তলোয়ার বের ক'রে ফেলল।

দড়িটা ধরে ঝুলে হঠাৎ একটা ভীষণ দোলা দিয়ে এক লাফে
গাছের ডাল থেকে জাগুয়ারের মতন তিনি কালীভূষণের
জাহাজের পাটাতনে এসে পড়লেন....

ছুটোছুটি করছিলেন। দূর থেকে বোম্বেটে জাহাজগুলির মাল্লারা ভাবল, ক্ষিতিভূষণের জাহাজের বোম্বেটেরাই ছুটোছুটি করে মরছে।

শেষে, বেগতিক দেখে সর্দাররা যে যাঁর শৌখীন পোশাক মাথায় বেঁধে অন্ধকারে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। শুধু প্রলয়কাণ্ডের উপদেবতার মতন সর্দারণী অগ্নিময় জাহাজে একা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন। অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখায় তাঁর আকাঙ্ক্ষার সাতমহলা প্রাসাদ তাঁর চোখের সম্মুখে ছাই হয়ে গেল।

১২

ক্ষিতিভূষণ এত সহজে কাজ হাঁসিল করতে পারবে স্বপ্নেও ভাবেনি। চিং-সর্দার বিনাবাক্যব্যয়ে তার ফাঁদে পা দেবেন, এ-বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কালীভূষণ যেমন সম্রাটের বিনা অনুমতিতেই অর্ধেক রাজকোষ নিয়ে এসেছিল, ক্ষিতিভূষণও প্রায় অনুরূপ একটি অসঙ্গত কাজ করেছিল। সম্রাটের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে সে তাঁর নামাঙ্কিত পাঞ্জাটি সরিয়েছিল। তার অদৃষ্ট তার কানে মন্ত্র দিয়েছিল, এই পাঞ্জা কূট কৌশলের খেলায় একটা অমোঘ অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করা চলবে।

ক্ষিতিভূষণের জাহাজের বোম্বেটেরা সবাই প্রাণপণে তার দুঃসাহসের খেলায় যোগ দিয়েছিল। আগের ব্যবস্থা মতন তারা জাহাজের মাস্তুলে আগুন লাগিয়ে আগুন নেভানোর অভিনয় করে জাহাজময় দাপাদাপি করে বেড়াল। তারপর সর্দাররা জাহাজে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে রশারশি ধরে নেমে পড়ে জাহাজের গায়ে বাঁধা লুকানো ডিঙিগুলিতে করে চিং-সর্দারের জাহাজের দিকে পাড়ি দিল।

চিং-সর্দারের জাহাজের পিছন দিকে এসে ক্ষিতিভূষণ অন্ধকারে নিজের পোশাক ছেড়ে ফেলে চিং-সর্দারের পোশাক পরে নিল। চিং-সর্দারকে নিজের পোশাক পরিয়ে তাঁর মাথায় বোম্বেটে মাল্লার ফেটি বেঁধে দিল। তারপর জাহাজের গায়ে ঝোলানো দড়ির মই

বেয়ে সে চিং-সর্দারকে কাঁধে বয়ে সন্তর্পণে জাহাজে উঠল। জাহাজের পিছনে পাটাতনে গাঢ় অন্ধকার। মুখ স্পষ্ট ঠাহর হয় না।

ক্ষিতিভূষণ সেখানে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল। এক বোম্বেটে সিপাই ছুটে এসে তাকে দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। জাহাজে হৈ চৈ পড়ে গেল চিং-সর্দার ফিরে এসেছেন।

ক্ষিতিভূষণ সেই অন্ধকার জায়গাটা থেকে নড়ল না। সে চারটি বোম্বেটেকে ইঙ্গিতে ডিঙিটা দেখাল। তারা ধরাধরি করে রাজকোষের সিন্দুকটা জাহাজের উপর নিয়ে এল। জাহাজের মাস্তুলের গায়ে কয়েকটা সাজানো কামরা। চিং-সর্দারের কামরা সেখানে অনুমান করে ক্ষিতিভূষণ সেদিকে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করল। বোম্বেটেরা সিন্দুকটা সেদিকেই বয়ে নিয়ে গেল।

ক্ষিতিভূষণের চালচলনে বোম্বেটেরা অবাক হয়েছিল। তাদের মনে হল চিং-সর্দার কিছুক্ষণের ভিতরই কালীভূষণের জাহাজ থেকে নূতন আদব কায়দা শিখে এসেছেন। তাদের ভিতর ফিসফাস শুরু হল। ক্ষিতিভূষণ বুঝল যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। সে ইঙ্গিতে বোম্বেটেদের সরে যেতে বলে প্রাণ হাতে নিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। তার জাহাজের বোম্বেটেদের জন্য সে অধীর অপেক্ষায় রইল। এক একটা মুহূর্ত তার এক একটা দণ্ড বলে বোধ হল। শেষে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এক এক করে তার মাল্লারা দড়ির মই বেয়ে যখন জাহাজে উঠে এল, সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু তখনই আবার শুরু হল খেলার শেষ পালা। জাহাজ দখলের কঠিন কাণ্ড। ক্ষিতিভূষণ তার মাল্লাদের জাহাজের পিছন দিককার পাটাতনে দু ধার ঘেঁষে অন্ধকারে মিশে ওৎ পেতে থাকতে বলল। সে ফিসফাস করে তার পূর্বের নির্দেশটা শেষবারে মতন ঝালিয়ে দিল। তারপর সে হাততালি দিল। চিং-সর্দারের একটি বোম্বেটে ছুটে আসতে সে যতটা সম্ভব গলাটা ঢেকে একটু

কেশে নিয়ে বলল, "মাল্লাদের সকলকে এখানে হাজির হতে বলো।"

চিং-সর্দারের জাহাজের মল্লারা পিল পিল করে এসে ভিড় করল। ক্ষিতিভূষণের মাল্লারা পিছন থেকে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাদের নাকে মুখে রোমাল চেপে ধরল। ছটফট করে চিং-সর্দারের মাল্লারা বেহুঁশ হয়ে পাটাতনে লুটিয়ে পড়ল। যে ক-জন হাত ফসকে বেরিয়ে এল, ক্ষিতিভূষণের মাল্লারা খোলা তলোয়ার নিয়ে তাদের তাড়া করল। কেউ জখম হল, কেউ বন্দী হল! জাহাজটা ক্ষিতিভূষণের পুরোপুরি দখলে এল।

এই যে বিরাট একটা কাণ্ড ঘটল, আশেপাশের কোনও জাহাজ টের পেল না। ক্ষিতিভূষণ আলোর নিশানায় সব জাহাজে সঙ্কেত পাঠাল। তারপর চিং-সর্দারের পোশাকে জাহাজের সম্মুখে এসে ভারী গলায় ঘোষণা পাঠ করল। এক সর্দারণী ছাড়া কারো মনে কোনও সন্দেহ জাগল না।

ক্ষিতিভূষণ অপেক্ষায় রইল। সর্দাররা যখন প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল, তখন সে বুঝল তার কৌশল ষোলো আনা সফল হয়েছে। ক্ষিতিভূষণের হুকুমে তার মাল্লারা পাল তুলে জাহাজ ছেড়ে দিল।

বোম্বেটে জাহাজগুলো অবাক হয়ে চিং-সর্দারের জাহাজে পাল উঠতে দেখল। কিন্তু তাদের কাছে চিংসর্দারের কোনও হুকুম এল না। তাদের সর্দাররা তখন অন্ধকার সমুদ্রে অসহায় অবস্থায় ভাসছে। সর্দারহীন জাহাজগুলি কী করবে স্থির করতে না পেরে আলোর সঙ্কেতে হুকুম চাইল। জবাবে আলোর সঙ্কেতে ক্ষিতিভূষণ কড়া হুকুম দিল, "সর্দাররা না ফেরা পর্যন্ত যে যার জায়গায় স্থির হয়ে অপেক্ষা করো।"

হতবুদ্ধি হয়ে জাহাজগুলো চুপ মেরে গেল।

ক্ষিতিভূষণের জাহাজ কালীভূষণের জাহাজের কাছাকাছি আসতে

সঙ্কেতে বুঝল কালীভূষণ তাকে মেঘবর্ণের জাহাজের কাছে যেতে বলছে। মেঘবর্ণের জাহাজের কাছে আসতেই মেঘবর্ণের জাহাজে পাল উঠল। মেঘবর্ণের সঙ্কেতে ক্ষিতিভূষণ দ্রুতবেগে সম্মুখে ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর সে লুকোনো ন খানা জাহাজকে সংঙ্কেতে সংবাদ পাঠাল। তারা তীব্রবেগে সম্মুখে ছুটে আসতে লাগল।

মেঘবর্ণ কালীভূষণকে সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করল, তাঁর এখন কী কর্তব্য। কালীভূষণ জবাবে বলল, তিনি ক্ষিতিভূষণের পিছনে পিছনে লঙ্কা যাত্রা করুন। মেঘবর্ণ জবাবে বললেন, রাজকোষ হাতের মুঠোয় এসেছে। কালীভূষণ কী কারণে একা বোম্বেটে জাহাজগুলির আওতায় অপেক্ষা করতে চান? কালীভূষণকে ফেলে তিনি এক পা-ও নড়তে রাজী নন। এক সঙ্গে অভিযানে এসেছেন, একসঙ্গেই ফিরবেন। কালীভূষণ জানাল, তার বহুদিনের একটা ঋণ আছে। সেই ঋণ শোধ করবার সময় এসেছে। ভবিষ্যতে সুযোগ নাও আসতে পারে। সুতরাং মেঘবর্ণ অবিলম্বে রওনা হয়ে ক্ষিতিভূষণের সঙ্গে মিলিত হোন এবং লঙ্কার রাজধানীতে পৌঁছান পর্যন্ত রাজপুত্রের ভার নিন।

কালীভূষণকে কিছুতেই যখন তার সংকল্প থেকে টলানো গেল না, তখন মেঘবর্ণ অগত্যা জাহাজে পাল তুলে লঙ্কার দিকে যাত্রা করলেন।

১৩

ফিকে জ্যোৎস্নায় আবছা আলোয় মেঘবর্ণের জাহাজ ক্ষিতিভূষণের জাহাজের পিছনে ছায়ার মতন ঢেউ উঠিয়ে অগ্রসর হল। পরে জাহাজ দুটি দিগন্তের মোটা রেখার সঙ্গে মিশে গেল। ঠিক সেই সময়ে দিগন্তের ধারে কয়েকটা বিন্দু ফুটে উঠল। কালীভূষণ বুঝলো লুকোনো নখানা জাহাজ সঙ্কেত পেয়ে ছুটে আসছে।

কালীভূষণ বুঝল সময় হয়েছে। এবারকার খেলায় ক্ষিতিভূষণের পালা ধুমধামে শেষ হয়েছে। এবার তার একটা অদ্ভুত পালা শুরু হতে চলেছে। এ হচ্ছে টাটকা রক্তে কিম্বা অন্তিম নিঃশ্বাসে ঋণশোধের পালা।

কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণের জাহাজের দিকটায় এসে দাঁড়াল। ক্ষিতিভূষণের জাহাজের একটা দিক পুড়ে একটা কঙ্কালের মতন দেখাচ্ছে। কিন্তু আগুন নেভানোর অভিনয় করতে গিয়ে ক্ষিতিভূষণের বোম্বেটেরা একদিকে যে পরিমাণে জল ঢেলেছিল, তার ফলে সেদিকটায় আগুন এগোতে পারেনি। জাহাজটা তখনো ডোবেনি। একদিকে সামান্য হেলেছে।

কালীভূষণ সবিস্ময়ে দেখল সর্দারণী তখনও পাথরের মূর্তির মতন অনন্ত আকাশের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কালীভূষণ এক পাক দড়ি তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "আমাদের পালা এবার শুরু হোক।"

কালীভূষণের কথায় সেই রহস্যময়ী সর্দারণীর দুটি চক্ষু এক মুহূর্তের জন্য প্রখর তেজে জ্বলে উঠল। পাষাণ প্রতিমায় প্রাণ সঞ্চারের মতন ধীরে ধীরে তাঁর দেহে সাড়া জাগল। অনন্ত আকাশ থেকে চক্ষু নামিয়ে তিনি সহাস্যে বললেন, "তারই অপেক্ষায় ছিলুম, কালীভূষণ।" তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে নিয়ে এক হাতে দড়িটা ধরে ঝুলে পড়ে হঠাৎ একটা ভীষণ দোলা দিয়ে এক লাফে গাছের ডাল থেকে জাগুয়ারের মতন, তিনি কালীভূষণের জাহাজের পাটাতনে এসে পড়লেন। এক ঝটকায় পরচুলাটা খুলে ফেলে তিনি দৃপ্ত ভঙ্গীতে কালীভূষণের পানে তাকালেন। কালীভূষণ একটু পিছন হটে গিয়ে খাপ থেকে তলোয়ার বার করে ফেলল। তারপর সে সম্মুখে গিয়ে দিব্যবর্ণকে প্রণাম করল। দিব্যবর্ণ তখন এক হাতেই কালীভূষণকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন। বহুকাল পর গুরু ও শিষ্যের মিলন হল। দুজনেই ভাবল, কী অদ্ভুত এই মিলন! কী আশ্চর্য এই তলোয়ার হাতে আলিঙ্গন!

আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে সহসা দুজনে লাফ দিয়ে পিছন হটে এলেন। দিব্যবর্ণ বললেন, "আজকের খেলার পালা এবার শুরু হোক। চিং-সর্দার ও বোম্বেটে সর্দাররা জানতে চেয়েছিলেন—পৃথিবীর সেরা বোম্বেটে কে? তাঁরা কেউ এখানে নেই। কিন্তু আরো অনেকে আছে, কালীভূষণ। এই মহাসমুদ্র, রহস্যময় ঐ দিগন্ত আর তারা-ভরা আকাশ। এসো, আজ দুজনে চরম খেলা খেলি।"

একটা উড়ন্ত পাখির মতন দিব্যবর্ণ কালীভূষণের উপর ছোঁ মেরে পড়লেন। বিদ্যুদ্বেগে সাপের ফণার মতন বেঁকে গিয়ে কালীভূষণ দিব্যবর্ণের আক্রমণ ব্যর্থ করল। দিব্যবর্ণ তলোয়ার হাতে কালীভূষণের চারিদিকে একটা অস্থির আলোয়ার মতন ঘুরতে লাগলেন। দিব্যবর্ণের উপর লক্ষ্য রেখে কালীভূষণ প্রায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দিব্যবর্ণ পিছনে যেতে সে আড় চোখে তাকিয়ে অবলীলাক্রমে হাত ঘুরিয়ে তলোয়ার চালাতে থাকল।

দিব্যবর্ণ হেসে বললেন, "সাবাস! একানন হয়েও তুমি দশাননের সমকক্ষ হয়ে উঠেছ দেখছি।"

কালীভূষণ বলল, "গুরুর বিদ্যা দিয়ে গুরুকে ঠেকাচ্ছি। কৃতিত্ব পুরোপুরি গুরুর।"

দিব্যবর্ণ লাফ দিয়ে উঠে কালীভূষণের তলোয়ারে প্রচণ্ড একটা আঘাত করে কঠোর কণ্ঠে বললেন, "তবে ছোটোবড়োর কথা ওঠে কেন?"

কালীভূষণ বলল, "জীবন এগিয়ে যায়। আজকের মানুষ কালকের মানুষকে হার মানায়। ছোটোবড়োর কথাটা রেষারেষির কথা নয়, গুরু, জীবনের জয়যাত্রার কথা। আমি তোমার চেয়ে বড় নই গুরু, তুমি আমার ভিতর তোমার চেয়ে বড়।"

দিব্যবর্ণ বললেন, "পৃথিবী এ-তত্ত্ব বোঝেনা ভাই। পৃথিবী যাকে বড় বলে, তাকে মাথায় তুলে নাচে। যাকে ছোট বলে, তাকে দুয়ো দেয়। তারা বলবে আমার দেওয়া বিদ্যেয় তোমার নিজের বিদ্যে জুড়ে দিয়ে তুমি আমায় ছাড়িয়ে গিয়েছ।"

কালীভূষণ বলল, "আমি তোমায় ছাড়িয়ে না গেলে তোমার অখ্যাতি রটত, গুরু।"

দিব্যবর্ণ দ্বিগুণ তেজে কালীভূষণকে আক্রমণ করে বললেন, "কিন্তু তুমি আমায় ছাড়িয়ে যাওয়ায়, যিনি আমার গুরু তার যে অখ্যাতি রটছে, কালীভূষণ!"

কালীভূষণ দিব্যবর্ণের আক্রমণ ঠেকাতে ঠেকাতে বলল, "তোমার গুরুর কথা আজ প্রথম শুনলুম। কে তোমার গুরু?"

কালীভূষণের তলোয়ারে কঠিন একটা আঘাত করে দিব্যবর্ণ বললেন, "আমার পৃথিবীতে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমার গুরু আমি। তার অসম্মান ঘটতে দেব না।"

কালীভূষণ আত্মরক্ষা করতে করতে বলল, "তুমি কি চাও আজ আমি প্রাণপণ করে তোমার সঙ্গে লড়ি?"

মনিবন্ধ বার করে আনলেন। অলঙ্কারটা সম্মুখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। তা থেকে ছুরির ফলার মতন তীক্ষ্ণ ছটা বার হল।

চিং বললেন, "ভেবেছিলুম এই মণিবন্ধ কালীভূষণ ও দিব্যবর্ণের একজন পাবেন। কিন্তু তাঁদের কেউ সভায় উপস্থিত নেই।"

মেঘবর্ণ সম্রাটের সিংহাসনের পাশে গিয়ে কানে কানে কী বললেন। সম্রাট চিন্তিতভাবে মেঘবর্ণকে পাশে টেনে অস্ফুট স্বরে বললেন, "কালীভূষণ যদি না ফেরে, তবে? দিব্যবর্ণের হাতে যদি তার হার হয়ে থাকে?"

মেঘবর্ণ অস্ফুট অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "সম্রাট! আমার কথা মিথ্যে হবার নয়। কালীভূষণের অদৃষ্ট আকাশে লেখা আছে। বিধাতার নিয়মে শুধু মৃত্যুর কাছেই ও হার মানবে, মানুষের কাছে নয়।"

সম্রাট বললেন, "তাহলে অদৃষ্টের হাতে বিষয়টা ছেড়ে দিয়ে আমরা সভার কাজ স্থরু করি।"

সম্রাট ক্ষিতিভূষণকে আহ্বান করলেন। তার গলায় বীর-কণ্ঠহার পরিয়ে দিলেন। সভায় উল্লাসধ্বনি উঠল। কিন্তু এই সময়ই সভার উল্লাসধ্বনি ছাপিয়ে উঠল একটা জয়ধ্বনি। সমস্ত রাজধানী যেন সেই জয়ধ্বনিতে যোগ দিল। তারপর সকলের দৃষ্টি সভার সিংহদ্বারের দিকে পড়ল।

আলুথালু বেশে একটা ঝড়ের মতন কালীভূষণ এসে সভায় ঢুকল। ক্ষিতিভূষণ পাগলের মতন ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। বীর-কণ্ঠহারটা কালিভূষণকে দেখিয়ে তার পায়ের ধূলো নিয়ে শিশুর মতন হাসতে লাগল। গম্ভীর একটা হাসি হেসে কালীভূষণ ছোটভাইয়ের মাথায় হাত রেখে বলল, "দেখিস, এ কণ্ঠহারের মান যেন প্রাণ দিয়ে রাখতে পারিস।" তারপর কালীভূষণ সম্রাটের সিংহাসনের সামনে এসে আভূমি নত হয়ে সম্রাটকে, পরে সম্রাটের নির্দেশে চিংকে অভিবাদন জানাল।

চিং বললেন, "কালীভূষণ! দিব্যবর্ণ কোথায়? আপনার ও দিব্যবর্ণের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কী মীমাংসা হল, বলুন। আমার কাজ শেষ করে আমি নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরে যাই।"

কালীভূষণ বলল, "দিব্যবর্ণ মাঝসমুদ্রে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। নিজমুখে মীমাংসার কথা কী করে বলি।"

মনিবন্ধটা সভার সম্মুখে তুলে ধরে চিং বললেন, "পৃথিবীর সেরা বোম্বেটে কে—এ-মীমাংসা না হলে এই মনিবন্ধ কাকে দিই?"

কালীভূষণ তার আংরাখার তলা থেকে দিব্যবর্ণের তলোয়ারের দুই টুকরো বার ক'রে চিংয়ের পায়ের কাছে রেখে বলল, "দিব্যবর্ণ তাঁর ভাঙা তলোয়ারের এই দুই টুকরো আপনার কাছে পেশ করতে বলেছেন। মীমাংসার ভার আপনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।"

চিং কালীভূষণের ডান হাতের কব্জিতে মণিবন্ধ পরিয়ে দিলেন।

সভায় তুমুল জয়ধ্বনি উঠল।